পারিবারিক

বুদ্ধদেব বসু

ডি, এম, লাইব্রেরি
৪২ কর্ন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রিট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪৩
অক্টোবর, ১৯৩৬

দাম দুই টাকা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা
মুদ্রাকর : শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেক্জান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৭ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

এক

দোতলায়, রাস্তার ধারে জানলায় বসে' টুনকি বিকেলের দিকে তার ছোট-ছোট ধারালো দাঁত দিয়ে একটা কাঁচা পেয়ারা ঠুকরে খাচ্ছিলো, এমন সময় তার মনে হ'লো তাদেরই বাড়ির দরজায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো।

দাঁতের ক্রিয়া তখনকার মত স্থগিত রেখে টুনকি ঘাড় উঁচু করে' তাকিয়ে দেখলো—আরে, তা-ই তো! কে এলো? টুনকি এক মুহূর্ত ভাবতে চেষ্টা করলো, কে। কিন্তু তার পরেই গাড়ির দরজা খুলে যে-লোকটি নামলো তার উপর চোখ পড়ামাত্র ধুপ করে' নামলো টুনকি জানলা থেকে এক লাফে।

—'দাদা এসেছেন, দাদা!'

দুমদাম করে' নামলো সে সিঁড়ি দিয়ে, সামনের আঙিনাটুকু পার হ'য়ে একেবারে রাস্তায়। সুমন্ত্র ততক্ষণে নিজের হাতেই তার ছোট বিছানা-বাক্স নামিয়েছে, চুকিয়ে দিচ্ছে গাড়োয়ানের পাওনা।

—'মোটে চার আনা বাবু?'

'আবার কত?'

'পক্ষীরাজ ঘোরা ছুটাইয়া আইলাম।'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো। 'আচ্ছা, নাও তবে', বলে' আরো একটা আনি দিলে। গোলাপি গেঞ্জি পরা গাড়োয়ান দাঁত বার করে' একবার হাসলো, তারপর লাগামে টান দিয়ে জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে তাদের চির-অভ্যস্ত শব্দটা করলে, বর্ণমালার চিহ্নে যেটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাড়ি চলে' গেলো।

টুনকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এইবার কাছে এসে সলজ্জভাবে বললে: 'কী করলে, দাদা, একেবারে পাঁচ আনা দিলে!'

'কেন, বেশি দিয়েছি নাকি?'

'বেশি না!' ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে টুনকি বলে' উঠলো, 'আজকাল ইষ্টিশান থেকে দশ পয়সায় আসে যে!'

'তা-ই নাকি?'

সুমন্ত্র আর-কিছু না-বলে' তার বাক্স-বিছানা তুলে নিলে। টুনকি ব্যস্ত হ'য়ে বললে: 'ওগুলো থাক্ দাদা, মহেন্দ্র এসে নিয়ে যাবে।'

'এর জন্যে আর মহেন্দ্রকে লাগবে না, চল্।'

ঘাসের আঙিনাটুকু পার হ'য়ে দু'জনে উঠে এলো একতলার খোলা বারান্দায়। দাদার আগমন-সূচক টুনকির চীৎকার ঘুমের মধ্যেও বিজয়ার কানে পৌঁচেছিলো। ঘুম তাঁর হালকা হ'য়ে এসেছিলো এমনিতেই, ওঠবার সময় প্রায় হয়েছে। ধড়মড় করে' উঠে দু' একবার চোখ রগড়ে আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুমন্ত্র তাঁর কাছে এসে জিনিসগুলো নামিয়ে চুপ করে' দাঁড়ালো। প্রণাম করলে না, কোনোদিনই সে প্রণাম করে না, প্রণাম করবার অভ্যেসই তার নেই।

পারিবারিক

বিজয়ার বড় ইচ্ছে হ'লো, একবার ছেলের গায়ে-মাথায় একটু হাত বুলোন, কিন্তু কী যেন, পেরে উঠলেন না। ছলোছলো ভরা চোখে তাকিয়ে বললেন : 'আজই এলি ?'

'আজই এলাম।'

'পয়লা তারিখ আসবি লিখেছিলি ?'

'কলেজ ছুটি হ'য়ে গেলো।'

'ও !' তারপর একটু চুপচাপ।

'পথে—ভিড় হয়েছিলো ?' আবার বললেন বিজয়া।

'হয়েছিলো—বেশি না।'

বিজয়া চুপ করে' ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন।

'একেবারে শুকিয়ে গেছিস যে রে।'

সুমন্ত্র নিজের কব্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললে : 'কই, না তো।' বারান্দা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে ছোট একটা ঘর, সেখানে এসে সুমন্ত্র হাতের কাছে যে-চেয়ারটা পেলো তাতেই বসে' পড়লো। এককালে তারই ঘর ছিলো এটা। কিছুদিন আগেও ছিলো। ঐ জানলার ধারে টেবিলে বসে'-বসে'ই সে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া তৈরি করেছে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে ঐ খাটেই মশারির নিচে বই নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনো রয়েছে তার খাট, তার টেবিল-চেয়ার, দেয়ালের আলমারিতে তার অধীত বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ পেন্সিল-অঙ্কিত একরাশি পাঠ্যকেতাব।

'তোর ঘর এখন ফাঁকাই পড়ে' থাকে', একটু ইতস্তত করে' বিজয়া বললেন। 'মাঝে-মাঝে পিণ্টু শোয় ; তা ছাড়া, বাড়িতে কেউ এলে-টেলে—'

পারিবারিক

'তা পিণ্টু তো এ-ঘরেই থাকতে পারে আজকাল।'

'উপরের বারান্দাতেই পিণ্টুর জায়গা করে' দিয়েছি। ওখানেই পড়ে, ওখানেই শোয়।' একটু চুপ করে' থেকে, একটু যেন ভেবে বিজয়া বললেন : 'পিণ্টুর আবার একটা ঘর! বাড়িতেই থাকে না, দিন-রাত্তির বাইরে-বাইরে।'

'ও! খুব ঘুরে বেড়ায় বুঝি?'

'আর-কিছুই করে না। নতুন সাইকেল শিখেছে, চাকার উপরেই আছে। আবার বয়স্কাউটের দলে ভর্তি হয়েছে—তারও তাড়না কম নয়।'

'রাইবেশী নাচও নাচে নাকি?' বলে' সুমন্ত্র নিজের মনেই অর্দ্ধ-স্ফুট হেসে উঠলো। একটু পরে বললে : 'ওর কোন্ ক্লাশ না হ'লো এবার?'

'থর্ড ক্লাশ হ'লো। হু-হু করে' ম্যাট্রিকুলেশন এসে পড়বে।'

'তা সময় তো কাটেই।'

'এবার য়্যানুয়েলে আবার অঙ্কে ফেল করেছিলো।'

মৃদু হাসলো সুমন্ত্র : 'অঙ্কে তো আমরা সবাই পণ্ডিত।'

'তা শোন্—ফেল করে' তো ভেকু-ভেকু মুখ করে' এসে দাঁড়িয়েছে। তোর বাবাকে বললে—হেডমাষ্টার বললেন তুমি একবার গিয়ে দেখা করলেই—ওঁকে তো জানিস, ও-সমস্ত ওঁর ধাতে নেই। বলে' বসলেন, বেশ, ফেল করেছো, থাকো আর-একবছর ঐ কেলাসেই। আমি কত বোঝালুম—আহা, একটা কথার জন্য ছেলেটার একটা বছর নষ্ট হবে! তা উনি তো কিছুতেই গেলেন না। দু'দিন পর ছেলে লাফাতে-লাফাতে এসে বললে : প্রোমোশন পেয়েছি।'

'দিলে প্রোমোশন ? আমাদের সময়ে কিন্তু কলেজিয়েট ইস্কুলে বেজায় কড়াক্কড় ছিলো।'

'শোন্‌ই। ওঁর সঙ্গে পরে একদিন হেডমাষ্টারের কোথায় যেন দেখা। পিণ্টুর কথা উঠলো। হেডমাষ্টার বললেন, ও আমাদের সুমন্ত্রর ভাই বলে'ই প্রোমোশন দিলুম। কেমন আছে আপনার বড় ছেলে ?' কথাটা বলে' বিজয়া সুমন্ত্রের চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

সুমন্ত্রও একটু হাসলো। তারপর হঠাৎ বললে, 'উঃ কী গরম !'

'গরম, না ? বিজয়া চারদিকে তাকিয়ে বললেন : 'একখানা পাখা নিয়ে আয় তো টুনকি. একটু হাওয়া করি।'

সুমন্ত্র ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠলো : 'পাগল নাকি ? হাওয়া করবে কী !'

বিজয়া হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি না করলাম, টুনকিই করুক।'

'না, না, কাউকে হাওয়া করতে হবে না, কেউ হাওয়া করলে আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগে।'

ততক্ষণে টুনকি কিন্তু একখানা পাখা হাতে করে' এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়া পাখাটা নিয়ে দু' একবার হাত নাড়তেই সুমন্ত্র এক ঝাপটায় বলে' উঠলো : 'আঃ করো কী ! বলছি ও-সব ভালো লাগে না।'

বিজয়া তক্ষুনি পাখাটা রেখে দিয়ে বললেন, 'থাক্ তাহ'লে বাপু।'

একটু লজ্জিতভাবে বলল সুমন্ত্র : 'এই তো দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে।'

বিজয়া আস্তে-আস্তে বললেন : 'তুই আসবি জানিনে তো—তা মাছ

তরকারি সব আছে, দুটো ভাত ফুটিয়ে দিইগে। স্নান করতে হ'লে যা এখন।'

'আমি তো খেয়ে এসেছি ইষ্টিমারে। স্নানও করেছি।'

'আহা—ও-সব খাওয়াতে নাকি আবার পেট ভরে!'

'ভরে না আবার! যা খেয়েছি, বাব্বাঃ!'

এতক্ষণে টুনকি একটা কথা বললে: 'কী খেয়েছো, দাদা?

'ওঃ, কত কী! অত খাওয়াও যায় না। আচ্ছা মা, ইষ্টিমারে কী চমৎকার কাঁটা-ছাড়ানো ইলিশ দেয়, তোমরা ও-রকম রাঁধতে পারো না? কী নরম, মুখে দিলে গলে' যায়।'

'কী যেন রে, ও-রকম আমরা তো কখনো রাঁধিনি। জলে সেদ্ধ করে' কুশ দিয়ে কাঁটা ছাড়ায় শুনেছি। মাছটাকে আগেই অতক্ষণ ধরে' সেদ্ধ করলে কী আর স্বাদ থাকে ছাই।'

'থাকে না! চমৎকার হয় খেতে। ও-রকম তোমরা পারো!'

কথাটা খচ্‌ করে' বিজয়ার মনে বিঁধলো। মনে পড়লো এই সেদিনও মন্তু বলেছে: 'মা, যত জায়গাতেই খাই, তোমার হাতের রান্নার মত অত ভালো কিছুই লাগে না।'

'হস্‌টেলের ঠাকুর কেমন রাঁধে রে?' একটু চুপ করে' থেকে তিনি বললেন।'

'ওঃ হস্‌টেলের আবার খাওয়া! দু'চক্ষে দেখতে পারিনে এই ঠাকুরগুলোকে। তোমরাও তো একটাকে পুষছো। একটা বাবুর্চি রাখলে পয়সা দিয়ে সুখ। সত্যি রাঁধতে জানে।'

'আহা—কত যেন বাবুর্চির রান্না তুই খেয়েছিস!'

'কেন, কলকাতার সব হোটেলে তো ওরাই রাঁধে।'

'হোটেলে খুব খাস্ বুঝি তুই ?'

'তা—খেতে হয় বইকি মাঝে-মাঝে।'

'অসুখ করে না ?'

'অসুখ করবে কেন ?'

'হোটেলগুলোতে তো সব যা-তা দেয়—কুকুরের মাংস, সাপের চর্বি—'

'এ কি তোমার এক-পয়সা-পেয়ালা চায়ের স্বদেশি দোকান পেয়েছো! বড়-বড় হোটেল—সব ভদ্রলোক আসে সেখানে, সায়েব মেম আসে। আলাদা কাণ্ড সেখানকার!'

'খুব সুন্দর বুঝি ?' টুনকি জিজ্ঞেস করলে।

কিন্তু টুনকির প্রশ্ন চাপা পড়ে' গেলো বিজয়ার মন্তব্যে :

'বলিসনি ঐ সায়েব-মেমগুলোর কথা। ওদের কি কোনো ঘেন্নাপিত্তি আছে, না বাছ-বিচার আছে। যা পায় তা-ই তো গোগ্রাসে গেলে।'

'তাই তো, তাই তো!' মাথা ঝেঁকে বলে' উঠলো সুমন্ত্র। 'যা-তা খায় বলে'ই তো ওদের অমন স্বাস্থ্য! যা বোঝো না তা নিয়ে কেন কথা বলো ?'

'বেশ, বেশ, সবই তুই বুঝিস। তাহ'লে এখন আর কিছু খাবিনে ?'

'চা খেতে পারি একটু।'

'চা! আর-একটু বেলা পড়ুক, কেমন ? এখন একটু সরবৎ করে' দিই, ঘোলের সরবৎ—'

'না, না—তোমাদের ঐ সরবৎ-টরবৎ আমি কোনোদিন খাইনে, জানো না ? যা বলছি তা-ই করো।'

পারিবারিক

একটু চুপ করে' থেকে বিজয়া বললেন : 'কী খাবি চায়ের সঙ্গে ?'

'যা দাও।'

'লুচি ?'

'লুচি—খেতে পারি।'

'আর বেগুনভাজা ?'

'অত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস কোরো না তো মা, যা হয় এনে দাও।'

বিজয়া দ্বিরুক্তি না-করে' চলে গেলেন।

সুমন্ত্র চেয়ার থেকে উঠে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিক কেমন চুপচাপ, নিঃসাড়, নিশ্চেতন যেন। জানলা দিয়ে একটুখানি রাস্তা চোখে পড়ে। যতদিন সে ও-ঘরে কাটিয়েছে, ও-রাস্তা সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু ভাবেনি। আজ লক্ষ্য করলো, কী সঙ্কীর্ণ ঐ রাস্তা, কেমন বিবর্ণ মেটে রঙের। আর হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো যে সে ঢাকা এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলো, টুনকি সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে কাছে ডেকে বললে : 'কী রে, কেমন আছিস ?'

টুনকি চুপি-চুপি বললে : 'দাদা, কলকাতা কেমন ?'

'খুব সুন্দর।'

'আমাকে একবার নিয়ে যাবে ?'

'যাবি তুই ?'

'কী করে' যাবো ?'

সুমন্ত্র একটু ভেবে বললে : 'বড় হ'য়ে যখন কলেজে পড়বি, তখন যাবি।'

'কই, দিদি তো এখানেই পড়ছে।'

'তুই বলিস বাবাকে।'

টুনকি হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলো।—'না, বাবাকে বলবো না। তুমি যদি নিয়ে যাও তো যাবো।'

সুমন্ত্র ওর ঝাঁকড়া চুলে দুটো মৃদু চড় দিয়ে বললে: 'আজ ইস্কুল ছিলো না রে?'

'ছিল তো। আজ কিনা শনিবার—'

'ও, আজ শনিবার।'

আজ শনিবার, মায়ারা আজ শিলঙ চলে' গেলে। আজ শনিবার।

সুমন্ত্র খাট থেকে নামলো, নিয়ে এলো সুটকেসটা ঘরের মধ্যে।

'ওটা একটু খুলবে, দাদা? দেখবো?'

'এই ছাখ্।'

কিন্তু সুমন্ত্রর বাক্সে আশ্চর্য্য লোভনীয় কোনো জিনিসই নেই। মামুলি-রকমের জামাকাপড়, প্রসাধনের টুকি-টুকি, খানদুই বই। ডালার সঙ্গে লাগানো কাপড়ের খাঁজ ঘেঁটে-ঘেঁটে সুমন্ত্র ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বার করলে। তাতে মেয়েলি ছাঁদে লেখা:

The Pines
Shillong.

অতি সহজ ঠিকানা, ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তবু সুমন্ত্র ঐ কাগজটুকু রেখেছে, তবু সুমন্ত্র কয়েকবার ঐ লেখাটুকু পড়লো। তারপর আবার ভাঁজ করে' রেখে দিলে খোপে।

—'কী সুন্দর গন্ধ, দাদা, তোমার বাক্সে।'

পারিবারিক

'গন্ধ—না?' সুমন্ত্র কাপড়ের তলা হাঁতড়ে-হাতড়ে ছোট্ট একটি নীল রঙের শিশি বার করলে।

'এসেন্স!', টুনকি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

'নে', হাত বাড়িয়ে বললে সুমন্ত্র।

টুনকি চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

'নে এটা।'

'এটা আমি—নেবো?'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো।—'ওটাতে এখন আর এসেন্স্ নেই।'

টুনকি ছোট্ট শিশিটা নাকের সঙ্গে চেপে ধরে' বললে: 'এসেন্স্ না-ই বা থাকলো, গন্ধ আছে। আ—ঃ!'

সুমন্ত্র বাক্স বন্ধ করে' রাখতে-রাখতে বললে, 'যা এখন, ভাগ্।'

দৌড়ে পালালো টুনকি, ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে।

সুমন্ত্র দরজাটা ভেজিয়ে দিলে, পকেট থেকে বার করে' ধরালে সিগারেট, চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো খাটে।

দুই

লুচি বেগুনভাজা ও বাড়ির তৈরি দুটি রসগোল্লা সহযোগে সুমন্ত্র তার নীরব ও নিঃসঙ্গ চা-পান শেষ করলে। একটু পরেই দিয়ে গেলো খবরের কাগজ। ঢাকায় খবরের কাগজ আসে বিকেলে। এ পত্রিকাটি তারই সঙ্গে এসেছে কলকাতা থেকে রেলে-ইষ্টিমারে। একটু আগ্রহ নিয়েই সে কাগজ খুললো—সময় কাটবে। কিন্তু একটু চোখ বুলুতেই বুঝতে পারলো, কাল সকালে কলকাতায় যে-কাগজ পড়ে' এসেছে এ তারই একটু পরিবর্তিত সংস্করণ। তারিকটা শুধু আজকের।

কাগজ রেখে দিয়ে সে উঠলো, হাত-মুখ ধুলো বাথরুমে গিয়ে। জামা-কাপড় বদলে প্রসাধন শেষ করতে আরো কিছু সময় নিলে। তারপর এসে দাঁড়ালো বাইরের বারান্দায়। পাঁচটা বাজে, কিন্তু আকাশে এখনো ভরা আলো। কী চুপচাপ পথ-ঘাট, কী চুপচাপ চারদিক। মাঝে-মাঝে দু' একটা পাখি ডাকছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাঁপছে তাদের আঙিনার পেয়ারাগাছের পাতাগুলো।

সুমন্ত্রর বড় ইচ্ছে করছিলো একটা সিগারেট খেতে—কিন্তু এক্ষুনি হয়-তো মা এসে পড়বেন। মা আসবেন, বাবাও এসে পড়তে পারেন।

তার চাইতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু বেরিয়ে কোথায়ই বা যাবে? রমনার মাঠ? একা-একা ঘুরবে? স্থানীয় বন্ধুদের সে মনে আনতে চেষ্টা করলো। গেলে হয় কারো বাড়ি। অশোক কেমন আছে না জানি।

মনে-মনে বোধ হয় অশোকের কথাই সে ভাবছিলো, এমন সময় বাইরে একটা বাস্ থামলো, নামলো লঘু পায়ে একটি মেয়ে, কুচকুচে কালো পাড়ের সাড়ি পরা, হাতে বই। বাড়ির দিকে আসতে-আসতে মাঝ পথেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো, চেঁচিয়ে উঠলো: 'দাদা!' তারপর দ্রুততরো পায়ে কাছে এসে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বললে:

'কখন এলে?'

'এই তো,' সুমন্ত্র মুচকি হাসলো।

'বা! আমরা তো এদিকে তোমার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলুম। শুনলুম তুমি নাকি চলেছো শিলঙ।'

সে-কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে সুমন্ত্র বললে: 'তোদের ছুটি হয়নি এখনো?'

'এই তো—হ'য়ে গেলো। আজই শেষ।'

'কী করবি ছুটিতে?'

'কী করবো! গড় নোজ।'

দু'জনে গেলো ঘরের মধ্যে, সুমন্ত্রর ঘরে। টেবিলের উপর বই-খাতা রেখেই অরুণা চেঁচিয়ে উঠলো: 'এই রে!'

'কী হ'লো?' জিজ্ঞেস করলে সুমন্ত্র।

'বোলো না—পিণ্টুটার জ্বালায় আর পারিনে—এমন দস্যি হয়েছে।

এই কলেজে যাবার সময় তাড়াতাড়ি আমার পেন্সিল-কাটা ছুরিটা এখানে রেখে গেলাম—নিয়ে ভেগেছে। কোথায় শ্রীমান ওরাং-ওটাং—কোন্ জাম্বুবনে বসে' লেজ নাড়ছেন !'

সুমন্ত্র হেসে বললে, 'খুব তো কথা বলতে শিখেছিস, অরু।'

এই মন্তব্যে অরুণা একটু খুসি না-হ'য়ে পারলে না। আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটু চাপ দিয়ে বললে, 'সকালবেলা হঠাৎ আমার একবার মনে হয়েছিলো যে আজ তুমি আসবে।'

'আমাদের সব মনে-হওয়াই যদি এ-রকম সার্থক হ'তো তাহ'লে আর কথা ছিলো না।'

অরুণা হঠাৎ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলে, 'মা, মা !' তারপর, সুমন্ত্রর দিকে ফিরে :

'বড়দিনের ছুটিতে তুমি এলে না, তা-ই নিয়ে মা কত যে প্যানপ্যান করেছেন। বাবাও কম যান না, কেবলই বলেন—ছেলেটা করে কী কলকাতায় ছুটিতে বসে' !'

'আর কী বলেন বাবা ?'

'বাবা কাজ ক'রেই সময় পান না—বেশি কথা বলবেন কখন ? মা-ই তাঁকে জ্বালিয়ে খান। —ওগো, তোমার ছেলে নাকি নাচের দলে গিয়ে ভিড়েছে !' বিজয়ার কথার সুরের অবিকল নকল করলো অরুণা।

সুমন্ত্র হেসে উঠলো। সেই মুহূর্তে বিজয়া ঢুকলেন ঘরে, ভাই-বোনে চোখে-চোখে ইসারা ঝলসে গেলো। বিজয়া বললেন : এই যে অরু এসেছিস—টেবিলে তোর ভাত রেখে এসেছি, খাগে, যা।'

অরুণা কপাল কুঁচকে বললে, 'আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, মা।'

পারিবারিক

'এই এক কথা মেয়ের—ভাত খেতে ইচ্ছে করে না। এই তো কলেজ-ফেরতা খিদে—এখন ভাত না খেলে চলে! যাবার সময় কি আর কিছু খাওয়া হয়! যা—আড় মাছের ঝোল আছে, তখন তো খেয়ে যেতে পারিসনি—পেটির মাছ রেখেছি একখানা।'

অরুণা বললে, 'যাচ্ছি।'

'কলেজ টলেজ ছুটি হ'লো, এবার খেয়ে-দেয়ে শরীর ভাল কর্ তোরা', বলে' বিজয়া চলে' গেলেন—উপরের ঘরে কাপড়চোপড় ছড়ানো রয়েছে, আলনায় তুলতে হবে।

সুমন্ত্র আর অরুণা পরস্পরের দিকে একবার তাকালো; হাসি ঝিলকিয়ে উঠলো দু' জনেরই মুখে।

অরুণা বললে: 'মা-র যেন মাথা-খারাপ হচ্ছে দিন-দিন। দিবারাত্র চড়কি-বাজির মত ঘুরছেন, আর খামকা যত কথা রোজ বলেন তা দিয়ে মোটা-মোটা তিন ভল্যুম ভরে' ফেলা যায়।'

'এবার শরীর-টরীর ভালো কর্ আরকি, ঢাকায় তো দুধ-মাছের ছড়াছড়ি!' মুখ টিপে হাসলো সুমন্ত্র।

'ঐ এক কথা ওঁদের মুখে—শরীর! শরীর! দিব্যি সুস্থদেহে প্রফুল্লচিত্তে আছি—শরীর যা একটু খারাপ হয় তা ওঁদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর শুনেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে সুমন্ত্র: 'মস্তুটা তো নাচের দলে ভিড়ে উচ্ছন্নেই গেলো!'

খিলখিল করে' হেসে উঠলো অরুণা।'—'উঃ, কত সব কথা! ওয়াইল্‌ড্! তুমি নাকি দিনে-রাত্রে কখনো হস্‌টেলেই থাকো না,

উদয়শঙ্করের হোটেলই নাকি তোমার ঠিকানা। আর, আর—' অরুণা হাসতে-হাসতে আঁচলে মুখ ঢাকলো।

'আর—কী?'

'একদিন নাকি মদ খেয়ে-হস্‌টেলে ফিরেছিলে-

মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো সুমন্ত্রর মুখ।—'কে বলেছে এ-সব কথা?'

'বলবে আবার কে? হাওয়ায় ভেসে আসে। বড়দিনের সময় এসেছিলো জিতেনবাবুর ছেলে—তোমাদের সঙ্গে পড়ে বুঝি—'

'কে বল্ তো?'

'প্রতাপ বুঝি নাম—'

'প্রতাপ! ও, সেই scumটা! সেইজন্যেই বুঝি আয় বাছা ঢাকায় আয় বলে' এত হাহাকার। ওঁরা বিশ্বাস করেছেন ও-সব কথা?'

'বাবা উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মা···কী জানি বাপু, কলকাতা জায়গা তো ভালো নয়', অরুণার কথায় আবার বিজয়ার সুর লাগলো, 'মাসে-মাসে এতগুলো যে টাকা নেয় তা-ই বা করে কী?'

'এতগুলো!' নাক কুঁচকে সুমন্ত্র বলে' উঠলো। 'টাকা বেশি চাইলেই উপদেশের একটি মালগাড়ি পত্ররূপে এসে হাজির হবে সে ভয়ে বেশি টাকা চাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।'

'এ-সব কিছুই হ'তো না, ক্রিসমাসে একবার এলেই পারতে।'

'ক্রিসমাসে কলকাতাতেই সবাই আসে, কলকাতা ছেড়ে কেউ যায় না।'

'এ-ছুটিতেও আসবে না, লিখেছিলে।'

'আসবো না লিখিনি তো, পরে আসবো লিখেছিলাম।'

পারিবারিক

'গেলে না কেন শিলঙ ?'

'শিলঙ গিয়ে কী হবে ? ঢাকার মত স্বাস্থ্যকর জায়গা কি আর জগতে আছে ! তা ছাড়া মাছ-দুধ-তরকারি—' সুমন্ত্র তার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা চেষ্টা করে'ও চেপে রাখতে পারলে না।

অরুণা হেসে উঠলো :

'যা বলেছো !' তারপর হঠাৎ সুর বদ্‌লে বললে : 'খুব নাচ-টাচ দেখলে, দাদা ?'

'উদয়শঙ্কর তো ঢাকাতেও এসেছিলো, দেখিসনি তোরা ?'

'তা দেখিনি ! তিনদিন দেখেছি। একদিন বাড়ি থেকে, একদিন কলেজ থেকে—'

'আর-একদিন ?'

'আর-একদিন—ও এমনি গিয়েছিলাম', অরুণা একটু লাল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললে : 'উদয়শঙ্করের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?'

'দেখা হয়েছে দু'একবার। কেমন লাগলো নাচ ?'

'ভালো লাগলো ; খুব, খুব ভালো লাগলো। কী সুন্দর দেখতে মানুষটা।'

'সুন্দর', সুমন্ত্র সংক্ষেপে বললে।

'সেদিন আমরা বাড়ি-সুদ্ধ সব গিয়েছিলুম—'

'সব ?'

'বাবা বাদে। বাবা তাঁর মক্কেলদের নিয়েই আছেন, নাচ দেখবেন কী ! কী যে ভালোবাসেন ঐ বাজে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে ! মা তো দেখে মুগ্ধ !'

'মুগ্ধ ! বলিস কী ?'

'তারপর যা মজার কথা বললেন ! তা মন্তু যদি এদের সঙ্গে একটু মিশেই থাকে, এমন কী দোষ করেছে !'

'ইস্—এত দয়া !'

'ও-রকম হয় মাঝে-মাঝে। যদি পারো ওঁদের সন্দেহ-ভঞ্জন করতে, শিলঙ যাবার পাস্‌পোর্ট জুটে যেতেও পারে শেষ পর্য্যন্ত।'

'অত গরজ নেই আমার', নিচু গলায় বললে সুমন্ত্র, দাঁতে দাঁত চেপে।

পাশের ঘর থেকে এলো টুনকির তীব্রস্বর : 'দিদি—খাবে এসো।'

'ঐরে ঘণ্টা বাজলো। আর-একটু দেরি করলেই তো মা এসে বকতে সুরু করবেন। খিদেও পেয়েছে, যা-ই বলো।'

'যা, খেয়ে আয়।'

অরুণা উঠে দাঁড়ালো।

'শোন্', সুমন্ত্র হঠাৎ বললে, 'অশোকের খবর রাখিস কোনো ?'

সেই মুহূর্তে অরুণা ছিলো দরজার কাছে, এবং সুমন্ত্রর দিকে ছিলো তার পিঠ ফেরানো, এটা ভাগ্যের কথাই বলতে হবে। নয় তো তার মুখের চেহারা দেখে সুমন্ত্র ভাবতো কী ? একটু সে চুপ করে' রইলো, নিলে নিজেকে সামলে। মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'আছে এখানেই।'

'এখানে আছে তা তো জানি। আসে-টাসে ?'

'আসে মাঝে-মাঝে', অরুণা আধো মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরে নিজেই আবার বললে, 'তোমাকে চিঠিপত্র লেখে না ?'

'কই, না তো।'

'তুমিও লেখো না বুঝি ?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে সুমন্ত্র বললে, 'যাই, ওর খোঁজ করে' আসি একটু।'

অরুণা তখন ইচ্ছে করলেই বলতে পারতো—গিয়ে কী করবে, তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখানে আসবেন। কিন্তু অরুণা বললে না, বলতে পারলে না।

বারান্দা পার হ'য়ে যেতে-যেতে বিজয়া বললেন, 'অরু, এখনো তুই দাঁড়িয়ে আছিস। খেয়ে নে না বাপু, ভাতগুলো তো কাল হ'য়ে গেলো।'

অরুণা অসহিষ্ণুস্বরে বলে' উঠলো : 'যাই মা, যাই।'

একা ঘরে, সুমন্ত্র দু' একবার পায়চারি করলে। বেলা পড়ে' এসেছে, এই গ্রীষ্মের এমন যে লম্বা দিন, তাও ঢলে' পড়ছে লম্বা ছায়ায়। এখনি হয়-তো বাবা ফিরবেন কোর্ট থেকে, আবার তাঁর সঙ্গে লম্বা সম্ভাষণের ফিরিস্তি। সুমন্ত্র তার ছোট আয়নার সামনে একটু দাঁড়ালো, চুলটা বুরুশ দিয়ে ঠিক করলো একবার, মস্ত সিল্কের রুমাল মুখে একবার বুলোলো, তারপর গেলো বেরিয়ে।

তিন

কিন্তু রাত্রের খাওয়ার সময়ের আগে বাবার সঙ্গে দেখা হ'লো না সুমন্ত্রর। হৃষীকেশবাবু সন্ধের পর কোর্ট থেকে ফিরলেন, সুমন্ত্র তখন বাইরে। সে যখন ফিরলো, হৃষীকেশবাবু তখন আপিস-ঘরে মক্কেল-পরিবৃত। বাজলো দশটা, আইনের জাল থেকে তবু বেরোবার লক্ষণ নেই। সুমন্ত্র তার মা-কে গিয়ে বললে, 'খাবো না, মা ?'

'খাবি এখন ? দেরি কর্ না একটু—উনি এলে পরে একসঙ্গেই খাবি। ওঁর সঙ্গে তো তোর দেখাই হ'লো না এ-পর্য্যন্ত।

'বড় ঘুম পেয়ে গেছে।'

'তা তো পাবেই—পথের কষ্ট কি কম! উপরের ছোট ঘরে তোর বিছানা করেছি।'

'কেন ?'

'ঘরটায় বেশ হাওয়া খেলে—আরামে শুবি। অরুণা শোবে বারান্দায়।'

'অত হাঙ্গামার কী দরকার ? আমি নিচের ঘরেই শোবো।'

'আহা—নিচের ঘরে বড় সুখ! পিণ্টুকে ওখানে—'

'না, না, আমি নিচেই শোবো বলে' দিলাম। আর কোথাও শোবো না।'

বিজয়া ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন : 'বিছানা তো পাতা হ'য়ে গেছে।'

'আমি পিণ্টুর বিছানাতেই শোবো।'

বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, যা তোর খুসি।'

সুমন্ত্র উদাসীনভাবে একটু শিষ দিয়ে ঘরের মধ্যে দু' একবার পায়চারি করলে। দেয়ালের কাছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে' উঠলো, 'বাঃ, সেই ছবিটা দেখছি।'

সুমন্ত্র আর অশোক একসঙ্গে। সুমন্ত্রর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগেকার শীতে তোলা। বসেছে দু' জনে দুটো হরিণের চামড়া ঢাকা মোড়ায়। পায়ের নিচে ছড়ানো অনেক নুড়ি পাথর। অশোকের গায়ে সুমন্ত্রর লতা-আঁকা খদ্দরের চাদর : দু'জনের মধ্যে অশোক দেখতে ভালো, ফোটোগ্রাফারই বদলে দিয়েছিলো। গলা-খোলা পাঞ্জাবিতে সুমন্ত্রর তরুণ কণ্ঠ ভারি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। সবে দেখা দিয়েছে গোঁফের রেখা, দু'জনের মুখেই কৈশর-সীমান্তের নিটোল নির্মলতা। সুমন্ত্রর মনে পড়লো সেই যে শীতের রোদ্দুরে তারা সাইকেলে করে' গিয়েছিলো ছবিওয়ালার কাছে। কী ভালো লেগেছিলো। কী ভালো লাগতো দু'জনের একসঙ্গে থাকতে। অশোক তখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে। দু'জনে একসঙ্গে কবিতা পড়তো।

'এ-ছবিটা—কোত্থেকে এলো?' মা-র দিকে ফিরে সুমন্ত্র বললে।

'ছিলো তোর বড় ট্রাঙ্কটায়।'

'ও-ট্রাঙ্কটায় তুমি আমার হাত দিতে গেছো কেন?'

'একদিন এমনি খুলেছিলাম—ঠিক উপরটাতেই ছিলো কাগজ জড়ানো।'

'তা আবার বাঁধিয়ে রেখেছো কেন ঘটা করে' ?'

'রেখেছি।' কথাটা নিতান্তই বাহুল্য।

সুমন্ত্র ছবির কাছ থেকে সরে' আসতে-আসতে বললে : 'এই ছবি বাঁধিয়ে রাখাটা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।'

'কেন, বাঁধিয়ে না-রাখলে ছবি থাকে নাকি ?'

সুমন্ত্র হঠাৎ চটে' গিয়ে বললে : 'থাকবে কেন ? কোন জিনিসটা থাকে ? মানুষ থাকে ?'

'কী যে বলিস ! ছবিটা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিলো, বাঁধিয়ে রেখেছি। হয়েছে কী তাতে ?'

সুমন্ত্র একটু নরম গলায় বললে : 'যত কাণ্ড তোমাদের—কোত্থেকে এক ছবি টেনে বা'র করে' ঘরের মধ্যে লটকেছো ! লোকে বলে কী ? তাও যদি ছবিটা ভালো হ'তো।'

'কেন, সুন্দর ছবি !'

'ঐ তো পদতলে শিলা-রাশি !' সুমন্ত্র হেসে উঠলো নিচু গলায়।

বিজয়া কথা বলতে-বলতে খাওয়ার টেবিল ঠিকঠাক করছিলেন, হঠাৎ বলে' উঠলেন : 'গেলাসগুলো সব কী হ'লো ? আস্ত এক ডজন গেলাস এলো এই তো সেদিন, তা আনতে সময় লাগে তো ভাঙতে লাগে না।'

সুমন্ত্র বললে, 'টেবিলের উপরেই তো গোটা কুড়ি গেলাস শোভা পাচ্ছে।'

'ছ'টা আছে—আর গুলোর যে কী গতি হ'লো—'

'তা এখন ছ'টার বেশি লাগবে কিসে ?'

'এখন লাগবে না বলে'ই যেখানে-সেখানে 'পড়ে' থাকবে নাকি? এমনি করে'ই তো গেছে।'

'তা ভাঙবে না? কাচের গেলাস তো ভাঙবারই জন্যে।'

'দু'দিন যাক্, নিজের যখন কিনতে হবে তখন বুঝবি।'

'এখনই বুঝছি, তোমাকেও দিতে পারি বুঝিয়ে। শোনো: যদি গেলাস না-ই ভাঙে, লোকে আর নতুন গেলাস কিনবে না; এবং নতুন গেলাস না-কিনলে ব্যবসা অচল হবে; এবং ব্যবসা অচল হ'লে আজকালকার এই সভ্যতাই থমকে দাঁড়াবে। বুঝলে? সুতরাং গেলাস ভাঙাটা যে আমাদের কত বড় সামাজিক কর্তব্য—'

'নে, নে, আর ফাজলেমি করতে হবে না, থাম্। এই চাকরগুলোর জ্বালায় আর পারিনে। পরের জিনিস বলে' একফোঁটা মায়া নেই। ঐ সুন্দর টী-সেটটাকে কানা করেছে সেদিন—

'কোন্ টী-সেট?'

'বাঃ, ঐ যে তুই সেবার কলকাতা থেকে এনেছিলি—'

'ও—হ্যাঁ, তাই তো', একটু লজ্জিতভাবে সুমন্ত্র বললে। 'ভেঙেছে বুঝি?'

'টী-পটের মুখটার কোণ ছুটিয়ে বিতিকিচ্ছি করেছে।'

'ও, ভাঙেনি!'

'ওকেই ভাঙা বলে। অত সুন্দর একটা সেট্—একটুখানি খুঁত হ'লেই গেলো।'

'অমন একটু-আধটু হওয়াই ভালো। আমার তো তা-ই ভালো লাগে।'

'তোদের ভালো-লাগা!' আর-কোনো মন্তব্য না-করে' বিজয়া ঢাক্‌না-পরা চেয়ারগুলোকে পর-পর ঠিক-মত সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। সুমন্ত্র উদাসীনভাবে তারই একটা চেয়ারে বসে' পড়লো। হাতে অনেক সময়, অথচ কিছুতেই মন নেই, এমনি তার মুখের ভাব।

'অশোকের এতক্ষণে আসা উচিত ছিলো', সাইডবোর্ডের ভিতরটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বিজয়া বললেন।

'অশোক—আসবে নাকি আবার?'

'ওকে খেতে বলেছি।' ছেলের মুখে খুসির দীপ্তি দেখবার আশায় বিজয়া মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু সুমন্ত্র নেহাৎ সাধারণভাবে বললে:

'আমি গিয়েছিলুম ওর বাড়িতে।'

'ও তখন এখানে। তুই যদি সোজা চলে' আসতিস তাহ'লেই দেখা হ'তো।'

'আমি একটু ঘুরে এলাম। তা ও খাবে তো আবার চলে' গেলো কেন?'

'কী যেন কাজ আছে বললে।' একটু চুপ করে' থেকে বিজয়া বললেন:

'বেশ ছেলে অশোক। ভারি ভালো লাগে আমার ওকে।'

'আসে বুঝি প্রায়ই?'

'বাঃ, রোজই তো আসে। ওদের ইউনিভারসিটির যত কিছু ব্যাপার হয়, নিয়ে যায় আমাদের। তুই যদি এখানে পড়তিস, বেশ হ'তো।'

'কেন বেশ হ'তো?'

'বেশ হ'তো আরকি। সেদিন ওদের থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলো—ষোড়শী করলে।'

'কে? অশোক করলে নাকি ষোড়শী?'

'না, না, অশোক করবে কেন—ছেলেরা সব করলে, বেশ হয়েছিলো।'

'তুমি আজকাল খুব নানা জায়গায় যাও বুঝি? নাচও তো দেখেছিলে, শুনলাম।'

'সে-ও অশোক! নয় তো আমার কি উপায় আছে এই ঘর-সংসার ফেলে কোথাও নড়বার?'

'কেন নেই? এই তো দিব্যি নাচে গেলে। থিয়েটারে গেলে।'

'যাই আরকি', একটু লজ্জিতভাবে বিজয়া বললেন। 'তাই বলে' কি যাবার কথা মনে হয় কোথাও? এই বুড়ো বয়েসে কি আর সখ থাকে কোনো?'

'মা! তুমি বুড়ো!' এতক্ষণকার উন্মনা আধ-মনা ভাব থেকে হঠাৎ চমকে উঠে সুমন্ত্র ধারালো গলায় বললে।

'বুড়ো না হই হ'তে আর কতদিন!'

'বুড়ো হ'তে খুব ভালো লাগে, না?' সুমন্ত্র প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো।

'আরে বোকা, মন্দ লাগলেই বা কী? বুড়ো যখন হবার তখন হবোই।'

'অনেক দেরি তার এখনো। আমি তোমাকে বলে' দিচ্ছি মা, কক্ষনো আর নিজেকে ও-রকম বুড়ো-বুড়ো বলতে পারবে না। বিশ্রী লাগে আমার। বি—শ্রী!'

বিজয়া মৃদু হাসলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু গুনগুনানির সুরে বললেন: 'তা বুড়ো কমই বা কী—এত বড় ছেলে যার—'

'নাও, নাও, তোমাদের এ-সব কথা মোটে ভালো লাগে না আমার।'

যেন ছেলের ইচ্ছা অনুসারেই বিজয়া হঠাৎ অন্য কথা তুললেন :

'তুই কেমন মানুষ রে মন্তু, এবারেও লিখেছিলি ঢাকায় আসবো না!'

সুমন্ত্র মা-কে সংশোধন করলে : 'আসবো না লিখিনি তো, পরে আসবো লিখেছিলাম।'

'শিলঙ যেতে চেয়েছিলে কেন ?'

সুমন্ত্র তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ দৃষ্টিতে মা-র দিকে তাকিয়ে বললে : 'কেন আবার ? এমনি।'

'এতদিন পর আমাদের একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না রে ?'

সুমন্ত্র মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে চুপ করে' রইলো।

আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বিজয়াও যেন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বলবার দরকার ছিল না কথাটা, বলে' ফেলে' তাঁর নিজেরও কেমন লজ্জা করছিলো। কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে হালকা সুরে তিনি বললেন :

'ঢাকারও আস্তে-আস্তে উন্নতি হচ্ছে বেশ। নাচ, নাটক, গান-বাজনা—একটা-না-একটা হুজুগ লেগেই আছে। সুন্দর রেস্টুরেন্ট হয়েছে নবাবপুরে, পিন্টুটা তো সেখানে গিয়ে আইস-ক্রীম খাবার জন্যে পাগল। বেশ লাইফ হচ্ছে আজকাল ঢাকায়।'

চেয়ারটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সুমন্ত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো :

'ছাখো মা, আর যা-ই করো, আমার সামনে কক্ষনো কোনো ইংরিজি কথা বোলো না।'

বিজয়া চুপ করে’ গেলেন। সুমন্ত্র একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে এলো দরজা পর্য্যন্ত। একটু দাঁড়ালো সেখানে: বাইরে যাবে, না ঘুরে আবার ঘরের মধ্যেই আসবে সেটা ঠিক করতে পারছে না যেন। একটু পরে ঘরের দিকেই ফিরছে এমন সময় বাইরের বারান্দায় খুব মৃদু জুতোর শব্দ হ’লো, আর পর মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলো অশোক সেন।

চার

অশোক ছেলেটি দেখতে বেশ। মানে, তার ঠিক সেই রকমের চেহারা যা দেখতে ভালো লাগে, এবং দেখলেই ভালো লাগে। আস্তে সে বলে, আস্তে চলে, তাকায় স্নিগ্ধ চোখে, হাসে মিষ্টি করে'। তাকে ভালো না-লাগা অসম্ভব, তাকে ভালোবাসা সহজ।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বন্ধুর সঙ্গে তার প্রায় ঠোকাঠুকি। মুচকি হেসে বললে অশোক: 'এই তো সুমন্ত্র এসেছে মাসিমা, আপনি তো কত ভেবেছিলেন।'

বিজয়া একটা বাসনের উপর ঝুঁকে পড়ে' দেখছিলেন পুডিংটা ঠিক জমেছে কিনা। চোখ তুলে একবার তাকালেন, কিছু বললেন না।

সুমন্ত্র অশোকের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিপাত করে' বললে, 'তুমি দেখছি দিন-দিনই সুন্দর হচ্ছো, অশোক।'

মৃদুহাস্যে মন্তব্যটা স্বীকার করে' নিয়ে অশোক বললে: 'তুমিও তো অনেক ফর্সা হয়েছো দেখছি।'

'গঙ্গার জল। তুমি এই এসে আবার কোথায় গিয়েছিলে?'

পারিবারিক

'খিদেটা জমিয়ে এলুম একটু হেঁটে। জঠরের পরিমাণ অল্প, মাসিমার রান্না বহুল।'

'হুঁ', অকারণ গম্ভীরস্বরে সুমন্ত্র বললে। 'চলো একটু ও-ঘরে গিয়ে বসি। পারিবারিক ভোজের ঘণ্টা বাজতে' কিছু দেরি আছে এখনো।'

সেই ছোট ঘরটিতে গিয়ে অশোক খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসলো। সুমন্ত্র বসলো বেতের চেয়ারটা মুখোমুখি টেনে নিয়ে, খাটের গায়ে জুতো-খোলা পায়ের চাপ দিয়ে। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার করে' বললে, 'খাও নাকি ?'

অশোক এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝামাঝিরকম একটু হাসলো।

সুমন্ত্র নিজে একটা সিগারেট নিয়ে বললে: 'খাও না বুঝি, উঁ ?'

অশোক মুখচোরভাবে বললে : 'একেবারে খাইনে তা নয়। অভ্যেস নেই।'

'তুমিই ধন্য !' দীর্ঘশ্বাস ফেললে সুমন্ত্র। 'তারাই ধন্য, যারা মাঝে-মাঝে সিগারেট খায়, অভ্যাস করে না। সে-রকম যদি পারতুম তবে আর ভাবনা কী ছিলো আমার !'

'অভ্যেস করলে বড় খরচ।'

'যা বলেছো ! তবে অভ্যেসটা করবার সময় খরচের কথা মনে থাকে না, আর খরচের ধাক্কা যখন লাগে তখন আর অভ্যেস ছাড়ানো যায় না। যাক্, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে' লাভ নেই, জীবনটাই এমনি।' সুমন্ত্র প্যাকেটের তলার দিকটা ঠেলে বার করে' অশোকের দিকে বাড়িয়ে ধরে' বললে : 'খাবে নাকি একটা ?'

পারিবারিক

অশোক একবার সিগারেটের দিকে, একবার দরজার দিকে তাকালো ঃ তারপর বললে : 'না, থাক্, এখন খাবো না।'

'খাও না !' একটু জোর দিয়ে বললে সুমন্ত্র।

'না, থাক্, কেউ হয়-তো এসে পড়বে।'

'পড়লোই বা এসে।'

'পাগল ! যদি মাসিমা আসেন—' ছবিটা যেন মনে-মনে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে অশোক বলে' উঠলো, 'ছি-ছি !'

'কেন ? ছি-ছি কেন ? যদি খেতেই পারো, লোকের সামনে খেতে পারো না ?' সুমন্ত্র নিজের সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে' ধোঁয়া টেনে নিয়ে নাক দিয়ে আস্তে-আস্তে বার করতে লাগলো।

'তাই বলে' মাসিমার সামনে !'

'তাই তো !' সুমন্ত্র হঠাৎ বলে' উঠলো। 'তুমি আমার মাসতুতো ভাই, এ-খবরটা নতুন জানলুম।'

অশোকের ফর্সা কান টুকটুক করে' উঠলো।—'ও একটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'

'কেন মাসিমা ডাকো ? আমার মা কি তোমার মা-র বোন ?'

'বা !' একটু আড়ষ্টভাবে জবাব দিলে অশোক। 'কিছু একটা ডাকতে হয় তো।'

'কেন ডাকতে হয় ? না ডেকেও তো দিব্যি চলে, চলে না ? আর মাসিমা বলে' যে ডাকো, সত্যি-সত্যি কি মাসিমা মনে করো ?'

কথাটা বিশেষ-কিছু নয়, কিন্তু অশোক যেন হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা

খেলো। প্রথমে সে লাল হ'য়ে উঠলো, তারপর গেলো ম্লান হ'য়ে, তারপর নিচু করলো মুখ। একটু পরেই মুখ তুলে বললে :

'অত মনে-করাকরির কী আছে, একটা কথা বই তো নয়। তুমিই বা এ নিয়ে এত বলছো কেন?'

সুমন্ত্র একটু চুপ ক'রে রইলো, তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো ঠোঁট বাঁকিয়ে।

'তা তোমার মাসিমার তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা।'

কথাটা, কথাটার সুর অশোকের ভালো লাগলো না। বন্ধুর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। এ-রকম কথা বলতে কোথায় শিখলো ও? এ-রকম তো ও ছিলো না। এ যেন সবটা-না-বলা কথা, এ-কথা যেন নিজেকে লুকিয়ে-রাখা। বেশি ভালো লাগলো না অশোকের।

সুমন্ত্রই আবার বললে : 'এবং তোমার মাসিমার এই উচ্চধারণা থেকে যাতে তুমি স্খলিত না হও, সেদিকেও তোমার যথেষ্ট নজর।'

'কী যা-তা বলছো!'

'তবে সিগারেট খেলে না কেন?'

'ধরো—এখন খেতে ইচ্ছে করলো না?'

'তা তো নয়। তুমি খেতে খুব ইচ্ছুক, কোনো নিরাপদ জায়গায় হ'লে তুমি নিশ্চয়ই খেতে। খেতে কিনা, বলো?'

অশোক চুপ করে' রইলো।

'অথচ এখন তুমি খেলে না, পাছে কেউ দেখে ফেলে। পাছে—আহা অশোক ভারি ভালো ছেলে—এ-কথাটায় কোনো চিড় ধরে।'

পারিবারিক

অশোক একটু ভেবে নিজের সমর্থন খুঁজে বার করলো :

'আমি সিগারেট খাই জানলে তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন। আর খামকা কারো মনে কষ্ট দেয়া কি উচিত ?'

সুমন্ত্র হাসলো :

'নিজের স্বার্থের জন্য আমরা যা করি, অনেক সময়েই সেটাকে পরোপকার বলে' চালিয়ে দিই। তারই নাম পলিটিক্স।'

'এমন সীরিয়স হ'লে তুমি কবে থেকে, সুমন্ত্র ?'

'পাগল! আমি সীরিয়স্! কিন্তু তুমিই বা এ-সব কপটতা শিখলে কবে ?'

কথাটা অশোকের বুকে লাগলো। সরল স্বভাবের জন্য চিরকাল সে হাত-তালি পেয়েছে। সত্যিও তার মধ্যে কোনো মারপ্যাঁচ নেই। মারপ্যাঁচ করতে সে জানেই না। সহজ সদ্ভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে তার মেলামেশা। শত্রু তার কেউ নেই, বন্ধুরা অনেকেই তাকে ভালোবাসে।

'কপটতা!' একটু আহত স্বরে সে বলে' উঠলো। 'এর মধ্যে কপটতা দেখলে কোথায় তুমি ?'

'তা নয় তো কী? তুমি সিগারেট খাও, কিন্তু সে-খবরটা রাখো যথাসাধ্য লুকিয়ে, পাছে এঁদের কাছে তোমার সুনামের হানি হয়। তার মানে তুমি সুনাম আদায় করছো ঠকিয়ে। এটা কপটতা নয় ? স্রেফ হিপক্রিসি!'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, সুমন্ত্র, একটা সামান্য জিনিসকে তুমি নিজের মনে ফেনিয়ে অকারণে বাড়িয়ে তুলছো।'

'এটা কেন মনে করতে পারো না যে আমি সত্যি-সত্যি যা,

সেই পরিচয়ই এঁদের দেবো—সিগারেট না-খাওয়ার উপরেই যে-ঠুনকো সুনামের নির্ভর তার লোভ না-হয় ছেড়েই দিতে। তার পরেও যদি এঁদের কাছে আদর পেতে, এটা অন্তত মনে করতে পারতে যে সে-আদরটা খাঁটি।'

'এত কথা! যে বলছো, তুমি পারো এঁদের সকলের সামনে সিগারেট খেতে?'

'কেউ জানবে বলে' ভয়ে মরিনে। খাই যখন, লোকে তো জানবেই।'

অশোক একটু চুপ করে' রইলো। সুমন্ত্র আবার বললে:

'তুমি যদি ভীরু না-হ'তে, তুমিও আমার মতই ভাবতে। ছল-ছুতো করে' সুনাম কাড়তে তোমার লজ্জা করতো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, না-হয় আর সিগারেট খাবো না, তাহ'লেই তো সত্যি হবে, কপটতা আর হবে না।'

সুমন্ত্র অশোকের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

'সিগারেট খাবে না তা-ও রাজি, তবু সুনামের উচ্চ আসন থেকে ভ্রষ্ট হবে না! ধন্য ছেলে তুমি, অশোক; জীবনে তোমার উন্নতি হবে।'

অশোক লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি বললে: 'আহা—ভারি তো জিনিস, খেলেই বা কী, না-খেলেই বা কী!'

তা-ই তো! যদি সে-কথাই মনে করো, তাহ'লে এত ঘাবড়াও কেন? আর সিগারেট খেলেই যাদের চোখে নেমে যেতে হয়, তাদের মতামতের উপর তো অবিমিশ্র অবজ্ঞাই থাকা উচিত।'

অশোক মুচকি হেসে কথাটা স্বীকার করে' নিলে।

পারিবারিক

'কী করবে, বলো ? সকলেই তো আর একরকম আবহাওয়ায় মানুষ হয় না।'

'কিন্তু মানুষমাত্রেরই র‍্যাশনাল হওয়া উচিত। ভেবে দেখবার, বোঝবার ক্ষমতা যার নেই, সে আবার মানুষ কী !'

'ভেবে দেখতে, বুঝতে তুমিই কি পারো সব সময় ?'

'সব সময় পারি না, চেষ্টা করি। কুসংস্কার থেকে, সংস্কার থেকে, অভ্যাসের জড়তা থেকে মনটাকে মুক্ত করে'ই দেখতে চেষ্টা করি সব জিনিস। তা না-করলে আমার আত্ম-সম্মান থাকতো না।'

'তুমিও তো একটা জিনিসকে ভালো বলো, আর-একটাকে বলো মন্দ। ভেবে ছাখো, সেটা তোমার ব্যক্তিগত রুচিরই কথা।'

একটু অসহিষ্ণুস্বরেই বললে সুমন্ত্র : 'রুচি এক কথা, আর সংস্কার আর। রুচি অনুভূতির ফল, আর সংস্কার জড়তার।'

অশোক কোনো জবাব দিলে না।

'আমাদের বুড়োমানুষদের ছাখো না', সুমন্ত্র বলতে লাগলো। 'বয়েসে বুড়ো নয়, মনে বুড়ো। সংস্কারের বস্তা এক-একটা। তারা যা বোঝে তার চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তারা যেমন চায়, ঠিক সেইরকম সবাইকে করতে হবে। নিজের ইচ্ছে-মত এতটুকু কিছু করতে পারবে না তুমি ; তুমি কেমন করে' চুল ছাঁটবে, সেটা পর্য্যন্ত তারা বলে' দেবে।'

এবারেও অশোক কিছু বললে না। এ-সব কথায় তার যেন বেশি মন নেই, খানিকটা এমনি তার ভাব। সুমন্ত্র সেটা লক্ষ্য করলে, লক্ষ্য ক'রে বললে :

পারিবারিক

'থাক্, প্রথম দর্শনেই এক পশলা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলুম। এবারে আর-সব খবর বলো। কেমন আছো ?'

অশোক বুঝি একটা মামুলিগোছের জবাব দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলো অরুণা। সঙ্গে-সঙ্গে অশোকের শিথিল ভাব দূর হ'য়ে গেলো, টান হ'য়ে বসলো সে, আলো ঝিলকিয়ে উঠলো চোখে। আর সেই চোখ অরুণার চোখের উপর পড়ে'ই সরে' এলো, আর অরুণা সুমন্ত্রর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে :

'খেতে চলো, দাদা, তোমরা।'

পাঁচ

হৃষীকেশবাবুর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি যদিও মুখে এখনো বয়েসের ছাপ পড়েনি। ক্রমান্বয়ে কুড়ি বছরের আইনের পেশা মুখে যে-ক'টা রেখা ফেলেছে, তার দোষ কাটিয়েছে মজবুত স্বাস্থ্যের জোর। শরীরটি তাঁর টনটনে। খাওয়াতে এখনো প্রচুর উৎসাহ; খেতে পারেন, খেয়ে হজমেরও ত্রুটি হয় না। স্বভাবতই উচ্চস্বরে কথা বলেন তিনি, এবং যে-কোনোরকম ভাববৈলক্ষণ্যে—উৎসাহে কি মতদ্বৈধে কি সামান্য অসন্তোষে—সে-স্বর মাত্রা ছাড়িয়ে চড়ে' ওঠে। লোকের সেইজন্যে তাঁকে বদমেজাজি বলে' ভুল হয়; কিন্তু যারা তাঁকে ভালো করে' জানে তারা তাঁকে সত্যিকারের ভালোমানুষ বলে'ই জানে।

মক্কেল-মুক্ত হৃষীকেশবাবু জমকালো খিদে নিয়ে বসেছেন টেবিলের মাথায়, ডানদিকে তাঁর সুমন্ত্র, আর বাঁদিকে অশোক, আর সুমন্ত্রর পাশে অরুণা। প্রাথমিক ভোজ্যবস্তু টেবিলে আনা হচ্ছে, এমন সময় সুমন্ত্র হঠাৎ বললে: 'তুই আমার চেয়ারটায় আয়, অরু।'

হৃষীকেশবাবু বলে' উঠলেন: 'কেন? কেন?'

'এখানটায় ভালো হাওয়া লাগে না।'

'হাওয়া লাগে না! আমি তো বেশ পাচ্ছি। পাখার ঠিক নিচে বসলেই তো হাওয়া পাবিনে—বোস্ ওখানেই।'

সুমন্ত্র শুধু বললে: 'আয়, অরু, এখানে।'

জায়গা-বদল হ'লো। অরুণা আর অশোক মুখোমুখি; সুমন্ত্র পিতৃদেব থেকে অন্তত একটা চেয়ার দূরে।

'কই, আনো না কী আছে তোমাদের', হাঁক দিলেন হৃষীকেশবাবু।

'এই তো, এই তো', ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বিজয়া। ভাত, বড়-বড় চাকতিতে ভাজা রুই আর রুইয়ের মাথার মুগের ডাল পরিবেষিত হ'লো।

সুমন্ত্র মাথা নিচু করে' আহারে মন দিতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ মুখ তুলে বললে: 'মা, তুমি বসবে না?'

'নে, নে; খা এখন', বিজয়া অন্যমনস্কভাবে বললেন।

'তুমি বসবে না? তুমি খাবে না?'

বিজয়া কোনো উত্তর না দিয়ে সুমন্ত্রর পাতে খানিকটা ঘি দিলেন ঢেলে।

'আঃ—আমাকে ঘি দিলে কেন? ঐ নাস্‌টি জিনিসগুলো কবে খাই আমি!'

'ঘি নাস্‌টি!' হৃষীকেশবাবুর নির্ঘোষ উঠলো বেজে। 'কে বললে এ-কথা? মূর্খ ছাড়া এ-কথা কে বলে!'

সুমন্ত্র নিঃশব্দে ভাতের বেড়া দিয়ে তরল সোনালি ঘিয়ের ছোট একটি দ্বীপ রচনা করলে। তারপর বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে: 'তুমিও বোসো না, মা। মহেন্দ্র বুঝি আর দিতে পারে না!'

'পাগল ! মহেন্দ্র দিলে কারো পেটই ভরবে না।'

'নিজেই যদি সব করবে, এতগুলো চাকরবাকর রেখেছো কেন? বোসো না তুমিও, একবারেই হ'য়ে যাক্।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোকে। তুই খা।'

সুমন্ত্র আবার মাথা নিচু করে' খাওয়ায় মন দিলে। একটু পরে বললে, 'অনেকটা যেন আপন মনে : 'তা খাবে কেন! সবার শেষে একা-একা বসে' চাকরদের মত না-খেলে তো তোমাদের পেট ভরে না!'

কথাটা হৃষীকেশবাবুর কানে গিয়েছিলো বুঝি, মাছের মুড়োর স্নিগ্ধ পদার্থগুলো আধ-বোজা চোখে ঘাড় কাং করে' শুষে নিয়ে সরস ও গাঢ় কণ্ঠে বলে' উঠলেন : 'স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে খাওয়ানো—তার চেয়ে বড় সুখ স্ত্রীলোকের জীবনে আর কী আছে!'

ফস্ করে' বলে' উঠলো অরুণা : 'একটু ভুল বললে, বাবা। এখানে কন্যাও আছে একজন।'

মাছের মুড়োর খোলসটাকে সোৎসাহে দাঁত দিয়ে আক্রমণ করে' হৃষীকেশবাবু বললেন : 'ওঃ, মেয়ে! মেয়ে আবার কে! মেয়ে তো পর!'

'পর'! অরুণা বলে' উঠলো। 'আমি তোমার পর!

মুড়োটাকে মুখের মধ্যে ছেঁচতে-ছেঁচতে অরুণার পিতা বললেন : 'বিয়ে হ'লেই তো হ'য়ে গেলো!'

'হ'য়ে গেলো!' অরুণা তার বড়-বড় কালো চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো।

'ত্যাখ্ না তোর মা-কে। তাঁরও তো মা-বাবা আছেন। কিন্তু কোথায় এখন মা-বাপ, আর কোথায় ভাই-বোন!'

অরুণা তার মা-কে দেখলো।

'তুইও তো তোর স্বামী-পুত্রকে এম্‌নি করে'ই খাওয়াবি—'

হঠাৎ সেই সুগভীর ও সুউচ্চ স্বরের মাঝখানে শোনা গেলো সুমন্ত্রর ক্ষীণকণ্ঠ :'—আর এমনি করে'ই তোর জীবন ধন্য হবে!'

'কী হে, সুমন্ত্র, কথাটা পছন্দ হ'লো না বুঝি? এ-সব বুঝি তোমাদের মডার্ন শাস্ত্রে লেখে না?'

সুমন্ত্র নিঃশব্দে খেতে লাগলো।

'তোরা কী বুঝবি, এই তো সেদিন তোদের জন্ম হ'লো! বাপের বাড়িতে কি মেয়েদের কোনো সত্তা আছে নাকি? বিয়ে হ'লে তবে তাদের জীবন আরম্ভ।'

স্ত্রীলোকের জীবন সম্বন্ধে এত শুনেও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না-হ'য়ে অরুণা বললে; 'আর-একটা ভাজা আছে নাকি মা—বড় ভালো হয়েছে।'

'নে, নে, আর মাছ-ভাজা খেতে হবে না', হৃষীকেশবাবু বলে' উঠলেন। 'মেয়ের আবার অত খাওয়ার সখ কী? কত দেবে শাশুড়ি খেতে!'

বিজয়া মাছ-ভাজার থালা নিয়ে এসে মেয়ের পাতে একখানা দিতে যাচ্ছিলেন, হৃষীকেশবাবু হাঁ-হাঁ করে' উঠলেন :

'তুমি খাবে না? চাকররা খাবে না? এদিকে তো আমার পাতে এক ঝুড়ি দিয়ে গেছো! এই নে।' নিজের পাত থেকে আস্ত একখানা ভাজা তুলে হৃষীকেশবাবু কন্যাকে দিলেন।

অরুণা মৃদুহাস্যে বললে: 'দিতে পারলে, বাবা, তোমার প্রাণে সইলো?'

পারিবারিক

হৃষীকেশবাবু প্রশস্ত হেসে বললেন : 'আমি খেতে ভালোবাসি তা ঠিক, এবং খাওয়ার সময় অন্য কারো কথা মনেও থাকে না—'

'মা-র কথা তো দিব্যি মনে থাকে দেখলাম', বললে অরুণা।

বিজয়া সলজ্জভাবে বললেন : 'নে, আর ফাজলেমি করতে হবে না। তুমি আবার ওকে দিতে গেলে কেন—এখানে তো কত ছিলো!'

বলতে-বলতে তিনি স্বামীর পাতে আর-একখানা ভাজা ফেললেন।

'আহা—হা! করলে কী, করলে কী! তোমরা কেউ খাবে না? আর-কেউ খাবে না? আমিই সব খাবো নাকি?'

অরুণা বললে : 'ইস্, খুব ভালোমানুষি, বাবা!'

হৃষীকেশবাবু অশোকের দিকে ফিরে বললেন : 'দেখলে! আমার খাওয়া নিয়ে আমার মেয়ে পর্য্যন্ত আমাকে ঠাট্টা করে। তা মন্দ না, মন্দ না—খাওয়াটা জীবনের একটা প্রধান সুখ তা তো ঠিকই। আর স্ত্রীলোকের আবার একটা খাওয়া কী—কী বলো? মেয়ে হ'য়ে যারা জন্মায়—'

সুমন্ত্র হঠাৎ চোখ তুলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললে : 'ছাখো বাবা, সমস্তক্ষণ ও-রকম মেয়ে-মেয়ে কোরো না, এ আমি তোমাকে বলে' দিলাম।'

হৃষীকেশবাবু এক মুহূর্ত্তের জন্য খেতে ভুলে' গেলেন :

'তুমি আমাকে বলে' দিলে! তুমি আমাকে বলে' দেবার কে সেটা শুনি?'

'বড় যে সব সময় মেয়ে-মেয়ে বলে' নাক শিঁটকোছো, এই মেয়েরা না-থাকলে তোমার কী দশা হ'তো সেটা একবার ভেবে দেখেছো?'

পারিবারিক

হৃষীকেশবাবু সুমন্ত্রর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন হা-হা করে'।

'বেশ, বে—শ, বেশ! এখন আমাকে ছেলের কাছে শিখতে হবে! এই তো বেশ!'

শেষের কথাটা ঘরের দেয়ালে আছাড় খেয়ে সীলিঙে প্রতিধ্বনিত হ'লো।

হাসির ধাক্কা সামলে উঠে হৃষীকেশবাবু মুড়িঘণ্টে মনোনিবেশ করলেন। তারপর খানিকক্ষণ কেউই কিছু বললে না।

হঠাৎ সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু বললেন: 'এই মন্তু, অত বড়-বড় চুল রেখেছিস কেন?'

সুমন্ত্র বললে: 'এই তো আসবার দিন ছেঁটে এলাম।'

'এ কী-রকম চুল ছাঁটা তোদের। সমস্ত চুল তো রয়ে'ই গেছে।'

মুহূর্তে সুমন্ত্র আর অশোকে চোখের বিদ্যুৎ ঝলসে গেলো। হৃষীকেশবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন:

'ঠিক আমাদের দেশের লেঠেল সর্দারদের মত। সেই আমাদের কামাখ্যা বরকন্দাজ ছিলো—এমনি ঝাঁকড়া চুল—পাঁচ হাত লম্বা লাঠি নিয়ে কী তার লাফ-ঝাঁপ!' অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে বর্ণনাটা সেরে হৃষীকেশবাবু নিজেই হেসে উঠলেন। আর-কেউ হাসলো না। সুমন্ত্র একবার ঢোঁক গিললো, লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ।

'কাল সকালবেলা নাপিত আসবে, চুলগুলো একটু ভদ্রলোকের মত করে' নিস্।'

পারিবারিক

সুমন্ত্র একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললে: 'মাথা কামিয়েও ফেলতে পারি, যদি বলো।'

'কোথায় শিখিস্ এ-সব আজগুবি ফ্যাসান! মাথা তো নয়, কাকের বাসা একটি। তা'ও বুঝি তেল দিসনে মাথায়।'

'তেল দিলে আমার মাথা ধরে।'

'তা তো ধরবেই। সব খাস সায়েব এসেছিস কিনা বিলেত থেকে। বিলিতি ঢঙ করতে গিয়ে ঐ তো রোগ পটকা শরীর করেছিস! আর ছাথ্ না আমাদের স্বাস্থ্য—এই বয়েসেও—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে অরুণা: 'এই বয়েসেও কী রকম খেতে পারি! সেটা আর মুখে বলতে হবে না, বাবা, উপস্থিত সেটা প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্ছে।'

'এ-বয়েসে তোদের বুঝি আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না। শিখেছিস কেবল অন্যের নকল করতে। আর শিখেছিস', ছেলের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু জুড়ে দিলেন, 'কিছু বললেই প্যাঁচার মত মুখ করতে।'

শেষের কথাটাতে যে-আপোষের ইঙ্গিত নিহিত ছিলো, সুমন্ত্রর উপর তা কোনোরকম কাজ করেছে এমন বোঝা গেলো না। সে রইলো মাথা নিচু করে', মুখটা চাপা উত্তাপে জমাট।

বিজয়া যখন দ্বিতীয় প্রস্থ মাছ নিয়ে ছেলের কাছে এলেন; সুমন্ত্র বললে: 'আর খাবো না মা।'

'আর খাবি না? সে কী! কিছুই তো খেলিনে!'

'রান্না সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহের সীমা না-থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ যা খেতে পারে তার তো একটা সীমা আছে।'

'কী খেলি ? এরি মধ্যে পেট ভরে' গেলো ?'

'খুব ভরেছে মা। খুব খেয়েছি। চমৎকার হয়েছিলো সব।' সত্যি, এতদিন হস্‌টেলের রান্নার পর যা-কিছু মুখে দিয়েছে সে, অমৃতের মত লেগেছে।

'একখানা ইলিশ মাছ খা, সর্ষে দিয়ে রেঁধেছি।'

'না, না, আর পারবো না।'

হৃষীকেশবাবু গলা-খাঁকারি দিয়ে বলে' উঠলেন : 'কোত্থেকে পারবে ! দিন-রাত খালি চা ! অত চা খেলে কি আর কারো খিদে থাকে !'

'তুমি আর বোকো না তো', স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত করে' বিজয়া বললেন। 'তোমার জ্বালায় ছেলেটা ভালো করে' খেতেই পারলে না। আজই তো এসেছে—বাড়িতে ঢুকেই এ-সব বাজে বকুনি শুনতে কার ভালো লাগে !'

'থাক্, থাক্, আর-কিছু বলবো না তোমার ছেলেকে। আমার আদ্ধেকও ও খেতে পারে না, এটা দেখে দুঃখ হয়—মনে দুঃখ হয়।'

'যে যত বেশি খেতে পারে, সে-ই তো তত বড় মহৎ মানুষ,' মুখ টিপে হেসে বললে অরুণা। 'দাদা যখন খাবেন না, মাছগুলো সব বাবার পাতেই দাও মা।'

'খাবে না কী ! খেতেই হবে ওকে। ওর মা নিজে গিয়ে রাঁধলেন, আর উনি এখন খাবেন না ! গায়ে লাগে না, না ?'

সুমন্ত্র আর প্রতিবাদ না-করে' একখানা মাছ গ্রহণ করলো। পিতৃদেবের সঙ্গে তর্ক করার চাইতে খেতে-খেতে ফেটে যাওয়াও বোধ হয় ভালো : এমনি মনে হ'লো তার।

পারিবারিক

'হস্‌টেলে খেতে-টেতে দেয় কেমন ?' জিজ্ঞেস করলেন বিজয়া।

'কেমন আর।'

মন্তর বুঝি ভালো করে' একদিনও পেট ভরে না, কেমন করে' উঠলো বিজয়ার বুক।

'ভালো লাগে ও-সব খেতে ?'

'কী যেন। খেতে হয়, খেয়ে যাই।'

এতক্ষণে অশোক একটা কথা বললে: 'হস্‌টলে থাকতে-থাকতে অভ্যেস হ'য়ে যায়। খাওয়া জঘন্য, কিন্তু সে-কথা মনে থাকে না !'

'কত জানি কষ্ট হয় ছেলেগুলোর !'

'কেন, কষ্ট হবে কেন ?' বলে' উঠলো সুমন্ত্র।

অশোক বললে: 'হস্‌টেলের ছেলেরা বেশ ফুর্তি করে'ই থাকে তো দেখি। আড্ডা, হৈ-চৈ, হুল্লোড়—'

'হ্যাঁ, ছেলেগুলো আড্ডা পেলেই সব ভুলে' থাকে।' বিজয়া ঘুরে এসে অশোকের পিছনে দাঁড়ালেন। 'তোমাকে আর-একখানা মাছ দিই, অশোক ?'

তাঁর কর্ণগোচর যে-কোনো প্রসঙ্গের আলোচনা হ'তে থাকলে হৃষীকেশবাবুর পক্ষে যোগ না-দেয়া অসম্ভব। ইলিশের সর্ষে দিয়ে তিনি ভাত মাখলেন, তারপর:

'কষ্ট ! হস্‌টেলের ছেলেদের কষ্টের কথা বলছো নাকি ? আরে তারা তো রাজার হালে থাকে। যে যা পারে আদায় করে' নেয় বাপের কাছ থেকে—তারপর মহাফুর্তি ! যা তারা চায় তা-ই পায়; যা তাদের খুসি তা-ই করে। কষ্ট ছিলো আমাদের সময়ে। ষোলো বছর বয়েসে

আমি ঢাকা কলেজে পড়তে আসি। কোথায় তখন রাজপ্রাসাদের মত এই সব হস্‌টেল! লক্ষ্মীবাজারের এক মেসে আমার বাসা! এক ঘরে পাঁচজন করে' থাকি। মেসের খরচ মাসে তিন টাকা—'

এই কাহিনীতে অশোক একবার বাধা দিলে: 'তা তিন টাকা কম কী তখনকার দিনে।'

'ও-রকম করে' আজকালকার কোনো ছেলে থাকতেই পারবে না যে!' বাধা পেয়ে কথার স্রোতে আরো তোড় লাগলো। 'কী আমরা খেতাম? ডাল, ভাত আলুসেদ্ধ—আর কলেজ থেকে ফিরে এক পয়সার বুটভাজা। কেরোসিনের একটা আলোয় তিনজনে মাথা ঠেসাঠেসি করে' পড়তাম—এক ঘণ্টার মধ্যে ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে যেতো চিমনি। এমনি করে' আমরা পড়াশুনো করেছি, এমনি করে' পাশ করেছি। মাসে আট টাকা খরচ সব সুদ্ধ।' এ-কাহিনী নিশ্চয়ই এত সংক্ষেপে শেষ হ'তো না, যদি না মেটাতে হ'তো ঔদরিক দাবি।

'আট টাকা?' অশোক মৃদু মন্তব্য করলে। 'কলেজের মাইনে?'

'তিন টাকা—'

'আর দু'টাকা দিয়ে কী করতে, বাবা?' সরল কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলে অরুণা।

'হাত-খরচ। খাতা-পেন্সিল থেকে ধোপা-নাপিত সব ওরই মধ্যে। পারতে তোমরা কেউ?' অশোকের দিকে তাকিয়ে সগর্ব্ব ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন হৃষীকেশবাবু।

'পারতাম কি না-পারতাম সেটা নিরূপণ করবার উপায় নেই তো', একটু হেসে অশোক বললে। 'অবস্থায় পড়লে সকলেই সব পারে।'

পারিবারিক

'দূর ! এখনকার ছেলেদের সে-রকম গ্রিট্ই নেই। আরামের কাঙাল সব, বিলাসিতার দাস। কী যে হবে এদের দিয়ে আমি তো ভেবে পাইনে।'

'বেশি ভেবো না, বাবা', অরুণা বললে। 'টোম্যাটোর টকটা খাও।'

অশোক বললে : 'আজকাল দেশের অবস্থাই এমন হয়েছে যে একটু ভালোরকম থাকা-খাওয়া ভদ্রশ্রেণীর অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে। কষ্ট করবার দরকারই হয় না আজকাল, এবং বাধ্য না-হ'লে কি কেউ কষ্ট করে !'

হৃষীকেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন : 'না, না, কষ্ট না-করলে কখনো মানুষ হয় না।'

অশোক খাওয়া শেষ করে' এক গেলাস জল খেয়ে নিলে :

'বরং বলতে পারেন মানুষ হ'লেই তাকে কষ্ট পেতে হয়। থাকা-খাওয়ার কষ্টটাই তো, মানুষের একমাত্র কষ্ট নয়। আর যাবতীয় কষ্টের মধ্যে সে-কষ্টটারই একেবারে কোনোরকম মহিমা নেই। মনুষ্য-সমাজ থেকে সে-কষ্টটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই তো আজকের দিনের লক্ষ্য।'

অশোক তার কথাটা শেষ করতে পেরেছিলো নেহাৎই মনের জোরে। যে-মুহূর্তে তার প্রথম বাক্যটি শেষ হয়েছিলো, সেই মুহূর্ত থেকে হৃষীকেশবাবুর মুখে টগবগিয়ে উঠছিলো প্রতিবাদ। সেটা অগ্রাহ্য করে' বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিলো অশোকের।

'এ-সব হচ্ছে তোমাদের নতুন ইকনমিক্সের বুলি', ডান হাত আহারে

ব্যাপৃত বলে' মাত্র বাঁ হাতেরই একটা প্রবল ভঙ্গি করে' হৃষীকেশবাবু বললেন। 'বইয়ে-পড়া বিদ্যে কি আর জীবনে চলে!'

'জীবন নিয়েই তো সমস্ত বইয়ের কারবার।'

'না, না', হৃষীকেশবাবু সশব্দে টোম্যোটোর টক চাখতে-চাখতে এ-বিষয়ের শেষ ও চরম কথা ঘোষণা করলেন। 'না, না, এ-যুগের ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না। কেবল আত্ম-সুখ, কেবল কষ্টের ভয়।··· এই টকটা আর-একটু দাও তো, বেশ হয়েছে।'

ছয়

বাইরে, পরদার ফাঁক দিয়ে খাবার ঘরের আলোর একটা লম্বা হলদে তীর বারান্দাকে দু'ভাগ করেছে। তা ছাড়া অন্ধকার। অন্ধকার রাত; কালো আকাশে তারাগুলো ঝকঝক করছে। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে থেকে-থেকে, থমকে-থমকে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে অশোক কী ভাবছিলো, টের পায়নি কখন্ অরুণা চুপি-চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—'এই, শোনো', অরুণা ডাকলে, চুপি-চুপি।

অশোক চমকে মুখ ফিরে তাকালো। আবছা আলোয় ভালো করে' মুখ দেখা যায় না। ফিকে নীলের উপর সাদা ডোরা-কাটা অরুণার সাড়িটা কেমন অদ্ভুত ঠেকছে এই আবছা আলোয়।

খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

'পান খাবে নাকি?' আস্তে একটু কাছে সরে' এলো অরুণা।

'দাও।'

অশোক হাত বাড়ালো। অরুণা তার মুঠ-করা হাতটা রাখলো

অশোকের প্রশস্ত, প্রসারিত হাতের উপর। সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলো তার ক্লান্ত হাত।

'তুমি সেজেছো ?' পান মুখে দিয়ে অশোক জিজ্ঞেস করলে।

'আগে বলো কেমন পান।'

'ভালো বলাটা নেহাৎ মামুলি হ'য়ে গেছে। অন্য-কিছু বলতে ইচ্ছে করে।'

'অন্য-কিছু !' অরুণা প্রতিধ্বনি করলে, আধো ঠাট্টার ঢঙে।

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ অরুণা কেমন মিনতির সুরে বললে : 'আমার বাবাকে ঐ-রকম মাথা-খারাপ মনে হয়—কিন্তু আসলে উনি খুব ভালো।'

'ও-কথা বলছো কেন ?'

'অন্যকে কথা বলতে দেন না একেবারেই, এটা ওঁর মস্ত দোষ। আমারও রাগ হয় মাঝে-মাঝে।'

অশোক ক্ষীণ হাসলো, কিছু বললে না।

'কিন্তু ওঁর যত চোটপাট সব মুখেই, মনে ওঁর কিছু নেই।'

'তা আমি জানি।'

'তবু এক-এক সময় বড় বাড়াবাড়ি করেন। দাদা তো আজ চটে'ই গেছে। তাতে কী হবে—উপরে গিয়ে বাবা আবার পাকড়েছেন ওকে। বক্তৃতা চলেছে।'

অশোক আবার হাসলো, এবার একটু শব্দ করে'।

'সেটা টের পাচ্ছি এখানে দাঁড়িয়েই। কানে আসছে গুমগুম আওয়াজ, কথাগুলো তলিয়ে যাচ্ছে। সেটা দুঃখের বিষয় বলতে পারিনে।'

পারিবারিক

অরুণা হেসে উঠলো, খুব জোরে নয়।

'যত বয়েস হচ্ছে এ-দোষটা বেড়েই চলেছে বাবার। ঠিক থাকেন এক মা-র কাছে।' একটু চুপ করে' থেকে অরুণা আবার বললে :

'আমার মা-ও খুব ভালো।'

'তা আমি জানি।'

আবার একটু চুপচাপ।

খুব নিচু গলায় অরুণা বললে : 'অন্য লোকের সামনে একেবারেই কোনো কথা বলা যায় না। ভারি মুস্কিল।'

'অন্যের সঙ্গে কথা বলা যায়, সেইটেই বাঁচোয়া।'

'কথা কইতেই হয়, নয়-তো—'

'নয় তো ?'

'কে জানে কে কী মনে করে !'

অশোক গম্ভীর হ'য়ে গেলো। ঘাড় ফেরালো অরুণার মুখ ভালো করে' দেখতে। অরুণার গালের উপর একটি স্খলিত অলক এসে পড়েছিলো, সেইদিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইলো সে। একটু পরে বললে : 'কেউ কিছু মনে করে নাকি ?'

'এখনো করে না।'

'পরে হয়-তো করবে ?'

'সেটাই ভেবে রাখা ভালো।'

অশোক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে' রইলো। তারপর :

'তা তো ভেবে রেখেইছি। সমস্তটাই ভেবে রেখেছি।'

পারিবারিক

ধ্বক করে' উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা। 'এক দীর্ঘ মুহূর্ত দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলো, পলক পড়ে না।

'এখন দাদা এসেছেন', চোখ নামিয়ে নিয়ে অরুণা বললে।

'হ্যাঁ, সুমন্ত্র এসেছে। ভালোই তো।'

'দাদা তো বুঝতে পারবেন দু'দিনেই।'

'তা তো পারবেই।'

'না—না!', হঠাৎ অরুণা বলে' উঠলো।

'কী? কী—না?'

'কেউ যেন না বোঝে। কেউ যেন কিছু মনে না করে।'

'এ-খেলা যখন খেলছোই, সমস্তটাই মেনে নিতে হবে।'

'খেলা!' অরুণার মস্ত একটা নিঃশ্বাস পড়লো।

'সম্পূর্ণ রূপক অর্থে', অশোক হাসলো। 'অত ভয় পেলে চলে?'

'হয়-তো এমন একটা কাণ্ড হবে—'

'তা তো হ'তেই পারে—শেষ পর্য্যন্ত।'

একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুব দ্রুতস্বরে বলতে লাগলো অরুণা: 'শোনো, তুমি না-হয় না এলে কিছুদিন। না—না, হঠাৎ না-আসাটাও চোখে পড়বে—চলে' যাবে কোথাও কিছুদিনের জন্যে?...পাগল! কী-সব যা-তা বলছি, কিছু মনে কোরো না।' নিজের কথার খেই হারিয়ে অরুণা ভাঙা-ভাঙা হেসে উঠলো।

'হঠাৎ তুমি এমন চমকালে কেন?'

'এসো আমরা খুব সহজ হই লোকের সামনে। খুব হাসিখুসি, খোলামেলা; খুব সাধারণ।'

পারিবারিক

'বরং এসো আমরা একদিন তুমুল ঝগড়া করি। তারপর থেকে কেউ কাউকে দেখতে পারবো না; আমার নাম শুনলেই তুমি কপাল কুঁচকোবে, তোমার কথা উঠলেই আমি করবো মুখ-ভার—বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠবেন আপোষের চেষ্টায়।'

অশোক আধো ঠোঁট খুলে একটু হাসলো।

অরুণার চোখেও হাসির ঝিলিক লাগলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে সে বললে: 'কী হয় জানো? এই তো দাদা এসেছেন, তাঁর সামনে তোমার দিকে তাকাতেই আমার ভয় করে; মনে হয় ধরা পড়ে' যাবো।'

'গেলেই বা।'

'ভয় করে, ভয় করে আমার', নিঃশ্বাসের স্বরে অরুণা বললে।

'কতবার তোমাকে বলেছি ভয় নেই। কোনো ভয় নেই', অরুণার কানের কাছে মুখ নিয়ে অশোক বললে। পলকের জন্য লাগলো তার ঠোঁটে অরুণার কানের উপরকার চুলগুলোর রেশম-স্পর্শ। সঙ্গে-সঙ্গে অশোক সরে' গেলো, যেন ভয় পেয়ে।

'আমার এক-এক সময় মনে হয় কী, জানো? একটু চুপ করে' থেকে অরুণা বলতে লাগলো। 'মনে হয়, এই তো বেশ আছি আমরা, এই তো বেশ আছি। এখনো আড়াল আছে, এখনো আমরা আছি ছায়ায় লুকিয়ে। যে-মুহূর্তে ছায়া সরে' যাবে···উঠবে ঝড়।'

'সইতে পারবে না?'

'এখনই কেমন করে' বলি? হয়-তো পারবো।···কিন্তু না পারি যদি?'

অশোক জুতোর শব্দ না-করে' কয়েক পা হাঁটলো, তারপর ফিরে এলো অরুণার কাছে।

পারিবারিক

'একটা কথা। আমাকে ঠিক বিশ্বাস করো তো তুমি ?'

'তোমাকে ! বিশ্বাস করি !' অস্ফুট শব্দে হেসে উঠলো অরুণা।

'না, বলো। আজ সময় হয়েছে।'

অরুণা তার তরল কালো চোখে তাকিয়ে বললে : 'কী তুমি শুনতে চাও আমার কাছে ?'

'বলো। আমাকে অভয় দাও, শক্তি দাও আমাকে।'

'আমি ! আমি অভয় দেবো !'

'তুমি ! তুমিই তো। তোমার মধ্যেই তো আমার শক্তির উৎস। তোমার অঙ্গীকারেই আমার নির্ভয়। এই যে ছাখো যুগে-যুগে দেশে-দেশে পুরুষের এত শক্তি, এত সাহস, তার মূল কোন্‌খানে ? কোন্‌ কালো চোখের অন্ধকারে ?'

'অমন করে' বোলো না তুমি, অমন করে' বাড়িয়ো না আমাকে। যদি জানতে আমি কত ছোট, কত দুর্ব্বল !'

'যদি জানতে তোমার ঐ ছোট হাতের কত শক্তি ! সে-কথা থাক্‌। আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো কিনা বললে না তো।'

'সে-কথা জানতে চাও ? তুমি বোঝো না ?'

'তবু বলো। মুখ ফুটে বলো।'

অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধের মত বলে' উঠলো অরুণা : 'পারি, পারি।'

'আর আমাকেই কি তুমি চাও মনে-প্রাণে ?'

'চাই, তোমাকেই আমি চাই।'

'খুব বেশি করে' চাও ? সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে' ?'

পারিবারিক

'সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তোমার মত আর-কিছুই চাই না।'

'সব ছাড়তে পারো আমার জন্যে? তোমার এই বাড়ি, তোমার ভাই, বোন, মা, বাবা?'

'পারি ছাড়তে। এই বাড়ি, আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা-বাবা।'

'বলো, আরো বলো। বলো আমাকে : তোমার হাত ধরে' বেরিয়ে পড়তে পারি হতাশার রাজপথে, পথ হারাতে পারি দুঃখের অরণ্যে, তোমার সঙ্গে যেতে পারি মৃত্যুর সিংহদরজা পার হ'য়ে।'

'তুমি নাও আমাকে, আমাকে নিয়ে চলো যেখানে তোমার খুসি। তোমার সঙ্গে আমি বেরুবো হতাশার পথে, যাবো দুঃখের মুখে, পার হ'য়ে যাবো মৃত্যুর দুয়ার।'

হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপটা উঠলো, বাইরে গাছের পাতায়-পাতায় বাজলো দীর্ঘশ্বাস। শিউরে চমকে উঠলো দু' জনেই। যেন একটা ঘুম ভাঙলো, একটা মোহ গেলো কেটে। চোখ চোখ পড়তে দু'জনে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

'কী-সব যা-তা বলছিলাম', অরুণা বললে।

'আমাকে যেতে হবে এখন। অনেক রাত হ'লো', বললে অশোক।

'ক'টা?'

অশোক অন্ধকারে তার হাত-ঘড়ির জ্বলজ্বলে কাঁটার দিকে তাকিয়ে বললে : 'দশটা—প্রায়। সুমন্ত্র কোথায়?'

'এখুনি উপর থেকে নামবে, এখানেই দাঁড়াও। বাবার হিতোপদেশের ঝড় শেষ হোক্।'

'ঝড়টা একদিন তোমার দিকেও আসতে পারে', অশোক হেসে বললে। 'প্রস্তুত থেকো।'

'আমার মা-বাবা খুব ভালো।' অরুণা কথাটা এমনভাবে বললে যেন তার নিজের ভিতরকার কোনো দ্বিধার খণ্ডন করছে।

'বার-বার বলছো কেন ও-কথা? জানো তো, আমাদের জাতে মেলে না।'

বলা হ'লো কথাটা, যে-কথাটা এতক্ষণ ধরে' প্রেতের মত তাদের মাঝখানে, এতদিন ধরে'। অশোক উচ্চারণ করলে তা : যেন এই অদৃশ্য প্রেতের ছায়া সে আর সইতে পারছে না, যেন সেটাকে কথায় স্পষ্ট মূর্ত্তি দিয়েই সে ভূত-ছাড়াতে চায়।

'আমাদের জাত আলাদা', অশোক আবার বললে।

'তাতে কী?' যেন খানিকটা জোর করে' অরুণা বললে। 'আজকাল তো এ-রকম কত হচ্ছে...'

'হচ্ছে তো।'

'তোমার মা-বাবা কেমন?' হঠাৎ অরুণা জিজ্ঞেস করলে।

'ওঃ, আমার জন্যে কিছু ভেবো না।'

'তাঁরা কি...তাঁরা কি আমাকে নেবেন না?' কথাটা বলতে অরুণার গলা বুজে এলো।

'খারাপটাই ভেবে রাখা ভালো, আশা-ভঙ্গের কষ্ট তো হবে না।'

একটু ম্লান হ'য়ে গেলো অরুণা।

'অত ভাবছো কেন?' অশোক বললে। 'আমি কি যথেষ্ট নই?'

পারিবারিক

'আমিই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হ'বো ? তোমার অত লোকসান কি ভরবে আমাকে দিয়ে ?'

কথাটা শুনে অশোক নিচু গলায় হেসে উঠলো।

'আমি কোনো আশা রাখিনে, সুতরাং আমি নির্ভয়। বুঝলে ? যে-মস্ত জিতের আশা করছি সেটা যদি হয়, অন্যপক্ষে কতখানি লোকসান হ'লো তা হিসেব করবার ফাঁক থাকবে না। কিছু ভাঙচুর হবেই—সে তো জানা কথা।'

অরুণা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে : 'কী সহজে বললে তুমি কথাটা।'

'তা ছাড়া', সাধারণ কথাবার্তার সুরে অশোক বললে, 'আমার পারিবারিক জীবন তো জানো।'

'মা প্রায়ই বলেন তোমার কথা—আহা, মা নেই।'

'আমার মা নেই ? আমার যাতে মা থাকে সেজন্যে আমার বাবা তিন-তিনবার বিয়ে করলেন।'

'অমন করে' বোলো না তুমি। বড় কষ্ট লাগে।'

'আমি তো এতে কিছু কষ্ট দেখতে পাইনে।'

'জানি, জানি, সবই জানি তোমার। কখন স্নান কখন খাওয়া কিছুরই কি ঠিক আছে ! ঘুরে তো বেড়াও সারাদিন আড্ডা দিয়ে, রাত্রে কখনো বারোটায় ফিরলে, কখনো বা বন্ধুর সঙ্গে শুয়েই কাটিয়ে দিলে, জানি না তোমাকে !'

'এ-ই তো ভালো। এইরকম জীবনই তো ভালো।'

'কেউ কিছু বলে না তোমাকে ?'

'কেউ কিছু বলে না। কী করিস কোথায় থাকিস ফিরতে এত রাত

হয় কেন কিছু না। এটা যে কী চমৎকার লাগে বলতে পারিনে। আর-কিছুর জন্যে না হোক্‌, ওর জন্যে বাবার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

'কী যে বলো! তাহ'লে আর স্নেহ-মমতার অর্থ কী?'

'স্নেহ-মমতার অর্থ যে কী তা নিয়ে তোমার-আমার চেয়ে অনেক বড়-বড় মাথাওয়ালা লোক সম্প্রতি গবেষণা করছেন। আমি এটুক বলতে পারি যে স্নেহ-মমতার পাওনাদার যদি এগারোটি সন্তান হয় তবে শেষ পর্য্যন্ত ইনসল্‌ভেন্সি নিতে হয়, তা ছাড়া উপায় থাকে না।'

'অমন করে' কথা বলো কেন তুমি? ও-জিনিসগুলোর কি কিছু মূল্য নেই?'

'আমার পক্ষে যে নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছো। যে যার মন নিয়ে থাকুক্‌, এ-ই তো আদর্শ অবস্থা। এর ব্যতিক্রমই অসহ।'

'তুমি যে-রকম বলছো, তোমার মা-বাবার সঙ্গে দিনে একবার হয়-তো তোমার দেখাও হয় না?'

'কখন হবে? কেমন করে' হবে? মা-বাবা থাকেন দোতলায়, আমি থাকি একতলায়। কখনো-কখনো যেতে-আসতে বাবার সঙ্গে দেখা হয় বাড়ির সামনের রাস্তায়।'

স্তম্ভিত, ব্যথিত হ'য়ে অরুণা তাকিয়ে রইলো অশোকের মুখের দিকে। সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করে' অশোক বললে:

'এত অবাক হচ্ছো কেন? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হ'লেই বা কী হবে? কী কথা বলবো আমি তাঁদের সঙ্গে? তাঁদের সঙ্গে আমার কোথায় মিল?'

'মা-বাপের সঙ্গে মিল নেই!'

পারিবারিক

'ও, হেরিডিটি! সে-মিল নাকের ছাঁদ মাথার টাক তুচ্ছ কতগুলো শারীরিক মুদ্রাদোষ পর্য্যন্ত। তার মানেই তো এ নয় যে মনের দিক থেকে কোনো সংযোগ আছে। যে-সংযোগটা খুব প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে আর্থিক। দুঃখের বিষয় বাবার কাছে এখনো মাঝে-মাঝে টাকা চাইতে হয়। সুখের বিষয়, তিনি চাইলেই টাকা দেন।'

'তুমি তো টিউশনি করো, শুনি।'

'করি। এই আর্থিক সংযোগটুকু একবার ছিঁড়তে পারলেই আর ভাবনা থাকে না।'

'ছি-ছি, যেন বাপে-ছেলেতে নেহাৎই টাকার সম্পর্ক!'

অশোক হেসে বললে: 'তুমি জানো না, এই টাকার সম্পর্কটা একবার ঘোচাতে পারলে পিতা-পুত্রে হয়-তো একটা সত্যিকারের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তেও পারে।'

'তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝিনে। শুনতেও ভালো লাগে না।'

'থাক্ তবে, আর না বললাম। আর সব-শেষের কথা হচ্ছে এই যে—'

কিন্তু কথাটা বলা হ'লো না। পিছনে শোনা গেলো সুমন্ত্রর স্যাণ্ডেলের ফটফট। খুব সহজ সুরে অরুণা বললে: 'তাহ'লে সেই বইটা আনতে ভুলো না, অশোক-দা।'

অশোক বললে: 'না, ভুলবো না।'

* * * *

পারিবারিক

সুমন্ত্র অশোককে রাস্তায় একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে বললে: 'একটা কথা, অশোক। আমার বাবার সঙ্গে তুমি তর্ক করো কেন?'

'অভ্যাসের দোষ, বলতে পারো।'

'ভবিষ্যতে আর কোরো না। আমার বাবার সঙ্গে যে তর্ক করে সে হয় নির্ব্বোধ, নয়···'

'···নয়?'

'নয় সে আমার বাবার মতই একজন। তর্ক তার সঙ্গেই চলে যার সঙ্গে মোটামুটি মেলে: যার সঙ্গে একেবারে কিছুই মেলে না, তার কথা চুপচাপ শুনে যেতে হয়—তারপর ভুলে যেতে হয়।'

সুমন্ত্র একটু ভেবে বললে: 'নয় তো কাজে দেখিয়ে দিতে হয়।'

সাত

'আর সব-শেষের কথাটা হচ্ছে…'

কী? মাথার নিচের হাত রেখে শুয়ে অরুণা চেষ্টা করলো ভাবতে এত কথা বলা হ'লো, তবু কিছুই বলা হ'লো না। এত কথা বলা হয়: কিছুই বলা হয় না। কোন্ কথা তারা বলতে চেয়েছিলো, এত প্রশ্নে, এত উত্তরে, এত নিরুত্তরে? কোন্ কথা তারা বলতে চায়, এত বলায়, এত না-বলায়? সব কথার পর সব-শেষের কথাটা হচ্ছে…কী?

পাশ ফিরে শুলো অরুণা। বড় গরম। ঘুম আসে না। এক-এক রাত্রে ঘুম আসতে চায় না, কী যেন হয়। জানে কী হয়। খাটের গা ঘেঁষে তার ছোট টেবিল, তার উপর টিকটিক করছে ছোট চৌকো টাইমপিস। টিক-টিক, টিক-টিক। ক'টা বাজলো? হয়-তো দেড়টা, হয়-তো মোটে বারোটা। তার মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে' সে শুয়েছে, অনেকক্ষণ ধ'রে সে শুয়ে আছে…কিন্তু আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলে হয় তো দেখবে আধ ঘণ্টাও হয়নি। তোমার সঙ্গে আমি যাবো হতাশার রাজপথে, দুঃখের মুখে, মৃত্যুর দরজায়। যাবো. যাবো আমি। যাবো তোমার সঙ্গে দুঃখের গুহায়, মৃত্যুর অরণ্যে। কথাগুলো কেমন অদ্ভুত, অদ্ভুত প্রতিধ্বনি

তুলে গুমরে ফিরছে বুকের মধ্যে। অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, এ যেন একটা অশরীরী অস্পষ্ট স্বর রাত্রির বুকের ভিতর থেকে উঠে এলো। সেই স্বরের স্পর্শে কাঁপছে অরুণার বুক। একটা স্বর···আর-কিছু নয়। কোন্ রহস্যময় ধ্বনি: এই অন্ধকার তার প্রতিধ্বনিতে উল্কি-আঁকা। দুঃখের দরজায়, মৃত্যুর সিংহদ্বারে। অরুণার হৃৎস্পন্দনে তারই প্রতিধ্বনি।

হয়-তো ভালোই হবে···শেষ পর্য্যন্ত···যদি সব ছাড়তে হয়। ছোট একটি বাড়ি কোনোখানে—যেখানেই হোক্। কী মানুষের দরকার? সব চেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষের কোন্টা? সব চেয়ে বড় ভয় বুঝি খেতে না-পাওয়ার, সেই ভয় দেখানোটাই শাসনের সব চেয়ে বড় অস্ত্র। কিন্তু কত আর খেতে পারে মানুষ, কত আর লাগে তার। আই-এ পাশ করলে সে-ও একটা মাষ্টারি জুটিয়ে নিতে পারবে। ছোট একটি বাড়ি···সে রান্না করবে। হায়রে, সে তো এ-পর্য্যন্ত কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকেনি, কী দিয়ে কী হয় কিছুই জানে না। ওঃ, সব পারবে সে, সব পারবে: কী না পারে মানুষ, কী না পেরেছে, যখন তার জীবনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন পূর্ণ হয়। ছোট একটি বাড়ি, টবে দু' একটা চারাগাছ।

সেই অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো অরুণা, আবছায়া ঘরের দিকে তাকিয়ে। এ-ঘর তার। সকালবেলা ঐ টেবিলে সে পড়তে বসে, পূবের জানলা দিয়ে রোদের ঝিলিমিলি। বিকেলে কতদিন জানলার ধারে বসে' থাকে আনমনা হ'য়ে, চুল বাঁধতে ভুলে' যায়। কোনো বন্ধু এলে এই ঘরেরই দরজা বন্ধ করে' কত প্রশ্ন, কত গোপন কথা। 'ওরে তোরা খাবিনে?' ডাকতে ডাকতে মা-র গলা ভেঙে যায়। রাত্রে এই খাটেই শোয়া—বালিসে যেই মাথা ছোঁয়ানো, অমনি ঘুম। বন্ধুর কাছ থেকে

পারিবারিক

দু'দিনের কড়ারে নভেল এনে তোড়জোড় করে' পড়তে সুরু করেছে শুয়ে-শুয়ে, কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছে মনেও নেই। মা এসে আলো নিবিয়ে গেছেন। মা-র কত খেয়াল। কখনো কিচ্ছু ভোলেন না। শোবার আগে রোজ একবার সবগুলো ঘর তাঁর দেখে যাওয়া চাই।

মা-কে সে খুব ভালোবাসে। বাবাকেও। খুব, খুব। তাঁদের ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে এই বাড়ি, এই তার ঘর। এখানে কোনো অভাব নেই, এখানে সুখ, না-চাইতেই এখানে সব পাওয়া যায়। এখানে একান্ত নির্ভরের নির্ভাবনা। সব ছাড়তে হবে। যেতে হবে দুঃখের পথে, হতাশার অরণ্যে! হয়-তো। দুঃখ, হতাশা, মৃত্যু। কী ঐ কথাগুলো, কী মানে ঐ কথাগুলোর? ভাবতে বুক ভরে' ওঠে যে, বুক ভরে' ওঠে। ঐ তো তার নিজের জীবন, তার নিজের জীবন নিজের হাতে সে নেবে। বাবা তো এই কথাই বলেন। তার মা-ও কি একদিন আসেন নি, এমনি সব ছেড়ে, সব ভুলে গিয়ে? তারপর দু'হাতে রচনা করেছেন নিজের জীবন। মা-রও তো মা-বাবা আছেন, তাঁরা এখন কোথায়? একবার দেখাও হয় না, একবার মনেও পড়ে না। তারও কি এমনি হবে? এরই জন্য কি মেয়েদের জন্ম?

টনটনিয়ে উঠলো অরুণার বুক। মনে পড়লো অশোকের পারিবারিক জীবন। ও বোঝে না, ও জানে না। দাদাও যেন কেমন! ছেলেরা কি অমনি হয়? ওদের কী, ওদের তো আর ছেড়ে যেতে হয় না! তাই ওরা অত সহজেই বলতে পারে—চাইনে ও-সব। অমন কথা কি মেয়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে কখনো! সে যে জানে একদিন তাকে ছাড়তেই হবে সব, অত মায়া তো তার সেইজন্যই।

পারিবারিক

মেয়ে পর : বাবা তো খেতে বসে'ও একবার বললেন। বাবা প্রায়ই বলেন কথাটা। পর : কথাটা শুনতে কী বিশ্রী, ভাবতে কী নিষ্ঠুর। কিন্তু এ-কথাই বাপ-মা জানেন মনে-মনে; মেয়ে নিজেও কি মনে-মনে জানে না? যা-ই বলো না, আমি তো আর কেবল অমুকবাবুর মেয়ে নই, আমি আলাদা একটা মানুষ, আমি আমি। কথাটা ভাবতে অরুণার রোমাঞ্চ হ'লো। আছে আমার নিজের একটা জীবন, সেই জীবনের আছে পূর্ণতার আশা। তোমার সঙ্গে আমি যাবো দুঃখের পথে, হতাশার নির্জনতায়।

এমনি হয়েছে তার মা-র, তার মা-র মা-র, চিরকাল কত কোটি-কোটি মেয়ের জীবনে। এমনি হবে। সেই যে একটা মুহূর্তে এসে জন্মের সমস্ত গাঁটগুলো নির্মমভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া—শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা অন্ত্র-তন্ত্র কি ব্যথায় ঝন্‌ঝন্ ক'রে বেজে ওঠে না! এ-কষ্ট ওরা কেমন ক'রে বুঝবে, ওদের তো ছাড়তে হয় না কিছু। তবু—মেয়ে যখন বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে চলে' যায়, তখন কি কেউ কাঁদে, বলো, কেউ কি কাঁদে তখন? কাঁদে : কিন্তু সে-কান্না কি কেবলই দুঃখের আর বিচ্ছেদের, সে-কান্না কি নিঃস্পন্দ আনন্দেরও নয় জ্যোতির্ময় মিলনেরও অশ্রু কি নয় সে?

মা-বাবা সম্প্রতি তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আভাসে ইঙ্গিতে টের পায় সে। চলছে লোকপরম্পরায় খোঁজাখুঁজি বলাবলি। ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না মনের মত। এ কী বিশ্রী উপায় বিবাহের, হাজার কথা-কাটাকাটি, হাজার এটা-ওটা ছল কৌশল মিথ্যা কথা ভাণ, যেমন ক'রে লোকে ব্যবসা করে। আর যে দু'জন মানুষকে নিয়ে এত কাণ্ড,

তারা লুডোখেলার গুটির মত পরের আঙুলে তাড়িত হ'য়ে-হ'য়ে কোনো-রকমে এসে পৌঁছয় বিবাহরূপ স্বর্গে। এ-প্রথা বাল্যবিবাহের, বাল্যবিবাহের এটাই উপায়। কিন্তু সাবালক পরিণত মানুষদের নিয়ে যখন কারবার তখন এটা শুধু যে অকেজো তা নয়, নিদারুণ অপমানের।

সে দিতে পারে বাঁচিয়ে তার বাপ-মার সকল দুর্ভাবনা, এত সব ঝকমারি। এগুলো তো সুখের নয়, এগুলো এড়াতে পারলে কে না খুসি হয়! সে নিতে পারে নির্বাচন ক'রে তার নিজের······কথাটা অরুণা মনে-মনেও উচ্চারণ করতে পারলে না। মা-বাবা কি খুসি হবেন না? এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? দু' হাত ভরে' কি আশীর্বাদ করবেন না তাকে—তাদের দু'জনকে? যে দু'জন মনে-মনে পরস্পরকে অঙ্গীকার করেছে তারা যখন মেলে, কত সহজ হয় সেটা, কত সুন্দর।

এত বোঝেন তার মা-বাবা, এটা বুঝবেন না? এত ভালোবাসেন তাকে তাঁরা, আর তার জীবনের সব চেয়ে গভীর প্রার্থনাকে কি ব্যর্থ হ'তে দেবন? তা কি হ'তে পারে?

অরুণা চোখ বুজলো শক্ত করে', চেপে-ধরা অন্ধকারে অসংখ্য লাল-নীল-বেগনি ফুটকি ফুটে উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে এত রঙ আসে কোত্থেকে? থেকে-থেকে আবার বদলায়, যেন রঙের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মেশামেশি, তারায়-তারায় কাটাকুটি। তা কি হ'তে পারে? তা কি হ'তে পারে? তা-ই যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে এই যে আমরা বলি মা-বাপের স্নেহ, তার মানে কী?

'স্নেহ-মমতার মানে নিয়ে তোমার আমার চেয়ে অনেক মাথাওয়ালা লোক সম্প্রতি গবেষণা করছেন। আমি এটুকু বলতে পারি······'

পারিবারিক

অশোকের স্বর বেজে উঠলো তার কানের কাছে, স্পষ্ট হ'য়ে। বাতাসে ভাসছে, সেই লঘু, শান্ত স্বর, তাতে ঈষৎ হাসির রেশ যেন লেগেই আছে। যেন ঘন কুয়াশা পার হ'য়ে এসে লাগছে, সুরটা পড়ছে ধরা, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। একটা স্বপ্নের মত হ'য়ে উঠলো, যার মধ্যে আমি নিজে কথাগুলো তৈরি করে' অন্যের মুখে চাপাই। এই যে দীর্ঘ অস্পষ্ট মর্মর, এ তো অরুণারই মন থেকে উৎসারিত হচ্ছে, কিন্তু বেজে উঠছে অশোকের স্বরে; অশোককে কথা কওয়াচ্ছে অরুণা, তার নিজের কথা দিয়ে। বলো, বলো, কিছু বলো আমাকে; ঘুমের আগে আমাকে কিছু বলো।

আট

পরের দিন রবিবার। রোজ তাড়াহুড়ো করে' খেতে হয় এগারোটার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে; আজ তার প্রতিশোধ। বহুল ও বিচিত্র ভোজ্যসম্বলিত দীর্ঘ ভোজ শেষ হ'তে গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলাও উঠলো হাঁপিয়ে।

ভোজান্তে পরিপাটি বিছানা, ধবধবে চাদর, মোটা-মোটা তাকিয়ার আরাম-আমন্ত্রণ। শিয়রে রূপোর ডিবেয় পান, পাশে জরদার কৌটো।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গোটা চার-পাঁচ পান একত্র করে' মুখে ভরে' হৃষীকেশবাবু ডাকলেন, 'ওহে মন্তু!

টুনকি বললে, 'দাদা নিচে!'

'এই না ওকে দেখলুম এখানে!'

'ডেকে আনবো, বাবা?' কিছু কাজে লাগবার আশায় ছোট টুনকির চোখ নেচে উঠলে।

'আন্। সারাক্ষণ ঐ নিচের ঘরটায় করে কী ও! আন্ ডেকে, যা। অরু, অরু কোথায় গেলি?'

উচ্চকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হ'লো অন্য প্রান্তে অরুণার ঘরে। হাতের নভেল ফেলে ছুটে এলো অরুণা।

'কী ? কী, বাবা ?'

'তোর মাকে একটু ডাক্ তো, অরুণা ।'

অন্যদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে বিজয়া বললেন : 'ব্যাপার কী ? চেঁচিয়ে যে বাড়ি মাথায় করে' তুললে এই দুপুরবেলা ।'

'কোথায় থাকো তোমরা সব ? দুটো পান দাও ।'

অরুণা হেসে বললে : 'তোমার ডিবেয় এখনো ভর্তি পান ।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু হাসলেন ।

'অরুণা, সেই তাস-জোড়া নিয়ে আয় তো রে ।'

'তাস !' বিজয়া বলে' উঠলেন । 'তাস দিয়ে কী হবে ?'

'একটু খেলা যাক্, এসো । আমি আর মন্তু । তুমি আর অরুণা । জেণ্ট্‌ল্‌মেন ভর্সাস লেডিজ ।' হৃষীকেশবাবু হা-হা করে' হেসে উঠলেন ।

'আমি এখন পারবো না বাপু ও-সব খেলতে', বিজয়া আপত্তি করলেন । 'একটু শুয়ে বাঁচি ।'

'পারবে না কী ! পারতেই হবে । নাও, ওঠো, বসে' যাও ।' বালিসের স্তূপ সরিয়ে হৃষীকেশবাবু জায়গা করে' দিলেন ।

'এসো না, মা, খেলি', অরুণা সোৎসাহে বললে । 'বেশ হবে । অনেকদিন খেলি না ।'

ছুটে গিয়ে তার টেবিলের দেরাজ থেকে সে তাস নিয়ে এলো । মাথা ঝেঁকে বললে :

'না, বাবা, আমি আর তুমি ।'

প্রচণ্ড শব্দে তাস কেটে হৃষীকেশবাবু বললেন : 'সেটি হবার নয় । আচ্ছা, তাহ'লে আয় ব্রে খেলি, তোর মা-কে কেমন ব্রে করে' দিই ছাখ্ ।'

পারিবারিক

'আহা—যাকে নিয়ে আবার খেলা! একবার ইস্কাবনের বিবি হাতে রেখে অন্য সব তাস ছেড়ে দিলেন, মনে নেই? তাস হাতে নিয়ে বসে' বাজারের হিসেবের কথা ভাবলে কি খেলা হয়! তার চাইতে পিণ্টকে নিয়ে বসাও ভালো।'

বিজয়া হেসে বললেন: 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো, পিণ্টুকেই ডাক্। আমিও বাঁচি তাহ'লে।'

'না, না, ও-সমস্ত চলবে না,' আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে' উৎসাহ উচ্চকিত কণ্ঠে হৃষীকেশবাবু ঘোষণা করলেন। 'অতটুকু ছেলে আবার তাস খেলবে কী! নাও, এসো। কোথায়, সুমন্ত্রবাবু কোথায়?'

বলতে-বলতেই সুমন্ত্রর প্রবেশ। তার মুখে বিরক্তির ভাব, দিবা-নিদ্রার আয়োজনে ব্যাঘাত পেলে সকলেরই যেমন হয়। কাপড়টা তার দু'ভাঁজে লুঙ্গির মত করে' পরা, গায়ে গেঞ্জি।

'এই যে এসো, বসে' যাও, ঐ কোণটায় বোসো। চলুক তাস খানিকক্ষণ। কই, অরুণা, বসলি না এসে? ওগো, তুমি আবার কোথায় গেলে?'

হাঁক-ডাক শুনে বাইরের লোক মনে করতে পারতো কী যেন একখানা কাণ্ড! তারপর সুমন্ত্রর দিকেই আবার তাকিয়ে:

'এসো, এসো।—ও কী, ও-রকম অসভ্যের মত কাপড় পরেছিস কেন?'

বিজয়া বললেন:—'পরেছে তো পরেছে। তুমি সবটা নিয়েই ও-রকম করো কেন বলো তো?'

'আহা—একটুখানি বলেছি তো কী হয়েছে। আমাদের চোখে যা

ভালো লাগে না তা নিয়ে আমরা অমন একটু বলবোই।' হৃষীকেশবাবু আরো দুটো পান মুখে দিয়ে বললেন :

'এসো, আরম্ভ করা যাক্ !'

সুমন্ত্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললে : 'আমি খেলবো না।'

'বাঃ !' হৃষীকেশবাবু গর্জন করে' উঠলেন। যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, এমন সময় তুমি একটি অশ্ব কিনা সব পণ্ড করে' দিলে। এসো, এসো—বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমার মা ব্রে হ'তে বেশি সময় নেন না, জানোই তো।' কথার শেষে হো-হো করে' তিনি হেসে উঠলেন।

সুমন্ত্র চুপ করে' রইলো।

সম্পূর্ণ তাসগুলো লম্বা চিকচিকে স্রোতে হাত থেকে বিছানায় ফেলতে-ফেলতে হৃষীকেশবাবু আবার বললেন : 'এসো, এসো। এদিকে দুটো প্রায় বাজলো। একটু ঘুমোতেও হবে তো রবিবারে।'

সুমন্ত্র কথা বলার একটা সুতো পেলো : 'আমার বড় ঘুম পেয়েছে।'

সে-কথা শুনতে না-পেয়ে, কি গ্রাহ্য না-করে', হৃষীকেশবাবু তাসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন : 'এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো অরুণা। দেরি করিসনে, আরম্ভ হ'য়ে গেছে।'

সুমন্ত্র এবার নিজে থেকেই বললে : 'আমি খেলবো না।'

হৃষীকেশবাবু এমনভাবে সুমন্ত্রর দিকে তাকালেন যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

সুমন্ত্র আবার বললে : 'আমি খেলবো না, তাস খেলতে আমার ভালো লাগে না।'

হঠাৎ হৃষীকেশবাবু অদ্ভুত অনুনয়ের সুরে বললেন: 'আয় না মন্তু, একটু খেলি।'

সুমন্ত্র বললে: 'বুদ্ধিমান সাবালক মানুষ কী করে' তাস খেলে সময় কাটায় আমি ভাবতে পারিনে।'

'দুঃখের বিষয় তুমি বুদ্ধিমানও নও, সাবালকও নও।'

সুমন্ত্র আর-কোনো কথা বললে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে কেমন বিশ্রী হ'য়ে গেলো যেন। একটু সময়, সকলেই চুপচাপ। তারপর হৃষীকেশবাবু তাসগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন লম্বা হ'য়ে।

'নে, অরুণা, তাসগুলো তুলে রাখ্।'

অরুণা জল আনতে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ছাখে এই কাণ্ড।

—'কী, বাবা, হ'লো না খেলা?' তার স্বরেও নৈরাশ্য।

'নে, নে, বিরক্ত করিস্‌নে এখন, ঘুমোতে দে।'

টুনকি ছিলো এই সমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী, এইবার সে এগিয়ে এলো।

'ঘুমোবে বাবা? তোমার পাকা চুল বেছে দিই?'

'পাকা চুল বললি যে? আমার চুল পেকেছে নাকি?'

'বা, সেদিনও তো তিরিশটা বার করলাম। দশটায় এক পয়সা দেবে বলেছিলে—'

'উঃ, এত!'

টুনকি হেসে বললে: 'দাওনি বাবা, এর আগেও দাওনি। তোমার কাছে সবসুদ্ধ আমি সাড়ে পাঁচ পয়সা পাবো।'

পারিবারিক

'বাপরে, টনটনে হিসেব! ঐ বুঝি ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুক-নাচ এলো। যা, ছুট্!'

ছোট-ছোট পায়ে ছুটে নেমে গেলো টুনকি।

'অরুণা, শিয়রের ঐ জানালাটা দে তো ভেজিয়ে।'

জানলা ভেজিয়ে অরুণা গেলো চলে'।

তারপর হৃষীকেশবাবু চোখ বুজে অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলেন। খাটের অন্যদিকে বিজয়াও কাৎ হয়েছেন একটু। তাঁর চোখ ঘুমে লেগে আসছিলো, এমন সময় হৃষীকেশবাবু হঠাৎ বললেন:

'মন্তুটার কী যেন হয়েছে।'

'উঁ?' ধড়মড়িয়ে চোখ মেললেন বিজয়া।

'মন্তুর কথা বলছিলাম।'

'কী?' ঘুমেল গলায় বিজয়া বললেন।

'মন্তুটা কেমন হয়েছে, দেখেছো? সারাক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়েই আছে। আগে তো এমন ছিলো না কখনো।'

'তুমিই বা ওকে ও-রকম বলো কেন সব সময়? ছেলে বড় হয়েছে সেটা মনে রেখো।'

হৃষীকেশবাবু হেসে উঠলেন:

'বড়! বড় হয়েছে মন্তু! মন্তু, মন্তু!'

'আমি তো ওকে কত সমীহ করে' চলি আজকাল।'

'মাথা খাচ্ছো আরকি। লেখাপড়ায় এত ভালো হ'লো ও, কিন্তু স্বভাবের এই ট্যারচামি না-সারলে তো কিছুতেই কিছু হবে না।'

পারিবারিক

'একটা কথা বলি, শুনবে?' ভীত, করুণ দৃষ্টিতে বিজয়া স্বামীর মুখে তাকালেন।

'তোমার আবার কী-কথা?'

'তোমার ছেলের কথাই। তুমি ওর উপর কোনোরকম জোর-জবরদস্তি করতে যেয়ো না। এ-বয়েসটায় ছেলেদের একটু হয়ই এ-রকম।'

'হয়ই, না? এ-বয়েসের ছেলের খবর আমার চেয়ে বেশি তুমি জানো, না? তিরিশ বছর আগে এ-বয়েসের ছেলে কে ছিলো—তুমি? না, আমি?'

এই অকাট্য যুক্তিতে বিজয়া তখনকার মত বোবা হ'য়ে গেলেন।

'আমরা তো কখনো এ-রকম ছিলুম না। কত কষ্ট করেছি ছেলেবেলায়—বাপ-মার যাতে সুখ হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য ছিলো।'

একটু চুপ করে' থেকে বিজয়া বললেন, খুব ভীরুস্বরে: 'সব মানুষ একরকম হয় না তো, সব সময়ও একরকম হয় না।'

হৃষীকেশবাবু অসহিষ্ণু উচ্চস্বরে বলে' উঠলেন: 'আরে এটা কি তোমার একটা কথা হ'লো! যে-ছেলে বাপ-মার মুখের দিকে একবার তাকায় না, সে আবার ছেলে কী! এখন তো দেখছি মেয়েই ভালো। অরুণা কি কখনো আমার সঙ্গে ও-রকম করবে! মস্ত বড় হয়েছে, মূর্খ হয়নি, ভেবেছিলুম ওকে এবার সব বলবো—দুঃখটা বুঝতে শিখুক—'

আঁৎকে বলে' উঠলেন বিজয়া: 'না, না, অমন কাজও তুমি করতে যেয়ো না। ও ছেলেমানুষ, দুঃখ বুঝবে কী করে'?'

'তুমিই না একটু আগে বললে ও বড় হয়েছে। আমাকে মনে রাখতেও বললে সেটা।'

লজিকের ত্রুটিতে কিছুমাত্র লজ্জিত না-হ'য়ে বিজয়া বললেন: 'আমরা তো ওর থেকে আসিনি, ও-ই এসেছে আমাদের থেকে। আমাদের দুঃখ ও বুঝবে কেমন করে' ?'

'বুঝবে না?' হৃষীকেশবাবুর কণ্ঠ এক লাফে পঞ্চমে উঠলো। 'আমি বুঝিনি? আমার বয়েস যখন আঠারো—'

'থাক্, থাক্, আমাকে আর কী বোঝাবে? আমি তো সবই জানি। যে যে-রকম ঘটনার চক্রে পড়ে, তেমনি তো হয়।'

'আজকালকার ছেলেদেরই এ-রকম ভাব দেখছি। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর!'

'আহা, এই সামান্য জিনিস নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন তুমি? কী করেছে মন্তু? তাস খেলেনি, এ-ই তো? না খেলেছে, বেশ করেছে। ভাল না-লাগলে খেলবে কেন? তা তোমার ছেলের নতুন গুণের কথা জানো তো—'

বলে'ই বিজয়া থমকে গেলেন। ভেবেছিলেন কথাটা স্বামীকে বলবেন না। সকাল থেকে চেপে ছিলেন। কিন্তু স্বামীকে সকল কথা বলা তাঁর তিরিশ বছরের অভ্যেস, সহজ নয় সেটা কাটিয়ে ওঠা। এমন অনেক কথাই গোপন করবার চেষ্টা করেছেন তিনি, শেষ পর্য্যন্ত পারেন নি। দু'ঘণ্টা আগে কি পরে, দু'দিন পরে কি আগে বলে' ফেলেছেন। এক অতর্কিত মুহূর্তে এ-কথাটাও বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে।

'কী? কী? কিসের কথা বলছো?'

পারিবারিক

জোর করে' মুখে হাসি টেনে এনে বিজয়া বললেন : 'আগে বলো রাগ করবে না ? ওকে বলবে না কিচ্ছু ?'

'দোষের হ'লে বলবো না? এমন অন্যায় অনুরোধ তুমি করবে কেন ?'

'দোষ মনে করলেই দোষ। ছেলেদের সব দেখি তো—ও-রকম দোষ আজকাল কোন্ ছেলেরই বা নেই !'

'কী হয়েছে তা-ই বলো না ! কী করেছে মন্তু ?'

ব্যাপারটাকে লঘু প্রমাণ করবার চেষ্টায় খুব বেশি করে' হেসে বিজয়া বললেন : 'মন্তু সিগারেট খায়।'

'সিগারেট খায় !' সোজা উঠে বসলেন হৃষীকেশবাবু, বসে' রইলেন বজ্রাহতের মত। কিছুই বললেন না খানিকক্ষণ, বলতে পারলেন না। হঠাৎ ফুটে উঠলো তাঁর চোখের সামনে মন্তুর ষোলো বছরের চেহারা। সে এমন বেশিদিনের কথা নয়। সুন্দর সুগোল মুখে সরল উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি। পাৎলা লালচে ঠোঁট দুটিতে খুসির ঝিলিক আছে লেগে। সেই ঠোঁট আজ সিগারেট চেপে ধরে' ধোঁয়া উগ্‌রোচ্ছে। তারপর সে-ছবি মিলিয়ে গেলো, এলো আট বছরের মন্তু, ঢোলা ইজের পরা, ছোট্ট শার্টের খোলা গলায় ধবধবে একটুখানি বুকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মন্তু মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ছোট্ট ঠোঁট দুটি কাঁপছে হাজার অকারণ অবান্তর প্রশ্নে। সেই ঠোঁটে আজ সিগারেট।

সেই ঘোরতর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরম মিনতির স্বরে বিজয়া বললেন : 'পায়ে পড়ি তোমার, ওকে কিচ্ছু বোলো না।'

'না, বলবো না', হৃষীকেশবাবু দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ছেলে উচ্ছন্নে যাক্, লম্পট মদ্যপ ব্যভিচারী হোক্, আমি কিচ্ছু বলবো না।'

পারিবারিক

ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসলেন বিজয়া স্বামীর পায়ের কাছে।—'ছী-ছী-ছি, কী যে বলো! একটুও আটকালো না তোমার মুখে ও-কথাগুলো উচ্চারণ করতে!'

'আজ সিগারেট, কাল মদ, পরশু...এমনি করে'ই তো অধঃপাতের পথে নামে মানুষ।'

বিজয়ার নিজের মনেও মস্ত খটকা লেগেছিলো, কিন্তু স্বামীর এই বাড়াবাড়িতে নিজের কোনো কথা তিনি বলে' উঠতেই পারলেন না। বরঞ্চ ছেলের পক্ষ টেনেই বললেন: 'আহা—সবটাকেই তোমার সাপঝল্‌কি ভাব। সিগারেট খেলে কী হয়? কে না খায় আজকাল সিগারেট শুনি!'

'এইটুকু বয়েসে!' গর্জে' উঠলেন হৃষীকেশবাবু। 'ও কি কিছু বোঝে! এখন কি ওর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার সময় হয়েছে! স্বাস্থ্য নষ্ট, অর্থ নষ্ট—এখন বুঝতে পারছি কেন ওর এত টাকা লাগে। নেশা করলে কি আর টাকা চোখে দেখা যায়!' তারপর হঠাৎ গলা নিচু করে' বললেন:

'তুমি—দেখেছো?'

'আজ সকালে ওর বিছানা তুলতে গিয়ে দেখি বালিসের নিচে সিগারেটের প্যাকেট।'

'তুমি কী করলে?'

'কী আর করবো—রেখে দিলাম সেখানেই।'

'ওকে কিছু বলোনি তুমি?'

'একবার ভেবেছিলাম বলি। তারপর বড় লজ্জা করলো।'

পারিবারিক

'লজ্জা করলো ! ছেলেকে শাসন করতে লজ্জা করলো তোমার !'

এই তিরস্কারের কোনো জবাব না-দিয়ে বিজয়া খুব আস্তে-আস্তে বললেন :

'আচ্ছা, মন্তুকে এখানেও পড়ালে তো হ'তো। এখানকার ইউনিভার্সিটি মন্দ কী—অশোক তো পড়ছে।'

হৃষীকেশবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, যেন কথাটা শুনতে পাননি, কি বুঝতে পারেননি। তারপর :

'এখন আর সে-কথা বলে' লাভ আছে কোনো ! আমি তো তখনই বলেছিলাম—কাজ নেই কলকাতায় গিয়ে। না, ছেলে বেঁকে বসলেন, কলকাতায় পাঠাতেই হবে তাকে। এখানে কি কোনো কম্পিটিশন আছে ! এখানে সিবিল সার্বিসের কোনো স্কোপ নেই—কত ভালো-ভালো কথা শুনলাম তখন। তুমিও ছেলের হ'য়ে ওকালতি করলে—আহা, ওর মন ভেঙে দিয়ে লাভ কী ? জোরজার করলে পড়াশুনোতেই মন বসবে না। তা বসবে কেন, এখানে থাকলে আমরা দেখতে-শুনতে পাবো তো ! অমন মহাস্বাধীন হওয়া তো চলবে না। বাবু এখন কলকাতায় ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন আর ফাইন আর্ট্‌স্‌-এর চর্চ্চা করছেন ! এখানে থাকলে তো খরচও কম হ'তো, তা বাবুর পোষাবে কেন ? এই যে এত-গুলো টাকা নেয় মাসে-মাসে, কী করে জানতে পারি ? স্কলারশিপ আছে তার উপর। তবু নাকি বাবুর কুলোয় না, নালিশ লেগেই আছে। রটার ! তুমিই তো ওকে নষ্ট করেছো ছেলেবেলা থেকে আহ্লাদ দিয়ে-দিয়ে !'

বিজয়া সপ্রতীক্ষ মুখে তাকিয়ে রইলেন। রাগের ঝড়টা যদি সুমন্ত্রকে ছেড়ে তাঁর উপর দিয়ে বয়ে' যায় তাহ'লেও তিনি বাঁচেন।

পারিবারিক

'টাকা নষ্ট করছে, নিজে নষ্ট হচ্ছে। কোত্থেকে আসে টাকাগুলো তা একবার ভাবে ও? একবার ভাবে সে-কথা!'

'সে-কথা ভাববার বয়েস তো নয় ওর।'

'না, বয়েস নয়!' স্বামীর চীৎকারে অ-প্রস্তুত বিজয়ার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে' কেঁপে উঠলো। 'আমার কাছে ও-সব দরদ করতে এসো না, আঠারো বছর বয়েসে একটা সংসার পড়েছিলো এই মাথার উপর।' হৃষীকেশবাবুর ডান হাত নাটকীয় ভঙ্গিতে উত্তোলিত হ'লো তাঁর মাথার উপর, তারপর ধুম্ করে' তাকিয়ার বুকের মধ্যে অনেকখানি গর্ত করে' দিলে।

'আঃ, কী করো! আস্তে কথা বলতে পারো না!'

'কেন, আস্তে বলবো কেন? ভয় করি নাকি কাউকে?' কিন্তু এ-কথাটাও হৃষীকেশবাবু বেশ গলা নামিয়েই বললেন।

'নাও, আর মাথা-গরম কোরো না তো, একটু ঘুমোও।'

হৃষীকেশবাবু শুয়ে পড়লেন বালিসে মাথা রেখে, চুপ করে' রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক আস্তে বললেন, স্ত্রীর দিকে না-তাকিয়ে:

'প্র্যাকটিসের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে।'

বিজয়া নিঃশব্দে স্বামীর পায়ে খুব আস্তে হাত বুলুতে লাগলেন।

'কয়েকটা বাঁধা ঘর আছে ব'লে টিঁকে আছি। কিন্তু এমনিতে যা অবস্থা। জীবন সরকারের অত বড় প্র্যাকটিস ছিলো—ফেলে-ছড়িয়ে মাসে দেড় হাজার দু' হাজার হ'তো, এখন টেনে-টুনে আটশোও হয় না সব মাসে।'

পারিবারিক

'জীবন সরকার তো শুনি একটা মাতাল।'

'ও মদ্যপান ব্যাপারটা আইনের ব্যবসায় বেশ চলতি। পার্ট অব দি গ্রেট ট্র্যাডিশন, বলতে পারো।' এক তোমার এই অযোগ্য স্বামীই ও-রসে বঞ্চিত রইলো।' হৃষীকেশবাবু হেসে উঠলেন। একটু পরে বললেন: 'থাক্‌গে, আমি কিছু ভাবিনে। শরীরে যতদিন রক্ত আছে, আর সে-রক্তে জোর আছে ততদিন ভাবনা কী। স্বাস্থ্যটা পেয়েছিলাম—'

'আর বোকো না তো, এখন ঘুমোও।'

স্ত্রীর মুখ ভালো করে' দেখবার জন্য হৃষীকেশবাবু পাশ ফিরলেন:

'ভাবনা কী, কিচ্ছু ভাবনা নেই। কেবল উপস্থিত অরুণার বিয়েটা—'

'আহা—একসঙ্গে সব ভাবনা উথলে উঠলো কেন তোমার? হবে, সবই হবে। কোনোদিন তো কিছু ঠেকে থাকেনি: কোনোদিন থাকবে না।'

'সেই যে পাত্রটির খোঁজ পাওয়া গেছে, না ফসকায়।'

'কে—কোন্‌জন?' বিজয়ার স্বরে স্পষ্ট উৎসাহের আভাস।

'আহা—তুমিও যেন দিল্লি থেকে এলে! সেই যে গাভার ঘোষ, বি-ই ছেলে, টাটানগরে চাকরি করে—'

'ও, হ্যাঁ, আমিও এটার কথাই ভাবছিলাম। তা এটা যদি হ'য়ে যায় ভালোই। আর-কোনো খবর পেলে নাকি ওদের?'

'ছেলে নাকি আসছে শিগগিরই ছুটি নিয়ে। মেয়ে দেখতে আসবে স্বয়ং।'

'তা তো শুনছি। তারপর আর দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে মুরারিবাবুর?

'তাঁর এজলাসে দেখা হয়, সেটা তো আর কথা বলবার জায়গা নয়। শিগগিরই এখান থেকে তাঁর বদলির কথা। তাঁরও ইচ্ছে তার আগেই—'

'বেশ তো, বেশ তো। তা তিনি একবার এসে অরুণাকে—'

'তিনি দেখবেন না', ঠোঁট বাঁকিয়ে হৃষীকেশবাবু বললেন। 'ছেলে দেখে পছন্দ করলেই নাকি হ'লো। জজ মানুষ—একটু মেজাজও আছে।'

বিজয়া গম্ভীরস্বরে মন্তব্য করলেন, 'হুঁ। দাবি-দাওয়ার কথা কিছু হয়েছে নাকি?'

'সে-রকম কিছু হয়নি এখনো—তবে দুটো পয়সা লাগবেই তো। সেই কথায় ভাবছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা', বিজয়া হাসিমুখে বললেন, 'আগে সব ঠিক হোক্ তো, তারপর টাকার ব্যবস্থা হবেই একরকম।'

'আকাশ থেকে তো আর পড়বে না। রোজগার তো কম করিনি জীবনে, একটা পয়সা হাতে নেই। টাকা যা আসে, সঙ্গে-সঙ্গেই তলিয়ে যায়।'

'তা নিয়ে আপশোষ করে' তো লাভ নেই এখন। টাকা জমানো হচ্ছে এক-একজনের স্বভাব: যে পারে সে দশটাকাতেও পারে, যে পারে না সে হাজার টাকাতেও পারে না।'

'একটা ইন্‌সিয়োরেন্সের টাকা সামনের বছর পাওনা হবে, ধার করতে হবে তাদের থেকেই।'

'না, না, ইন্‌সিয়োরেন্সের টাকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, ঐ তো শেষ সম্বল।'

কথাটা হঠাৎ হৃষীকেশবাবুর মনে লাগলো। তাই তো, কেবল

ছেলেমেয়েদের কথাই তিনি ভাবেন, স্ত্রীর কথা কখনো নয়। স্ত্রীর কথা আলাদা করে' ভাববার দরকার করে না, কিন্তু···ধরা যাক্···আজ যদি হঠাৎ তিনি মারা যান? কোথায় দাঁড়াবে বিজয়া? একটা বাড়ি পর্য্যন্ত নেই যে মাথা গুঁজবে। ছেলে? ছেলে বড় হোক্ কৃতী হোক্, এটা সব বাপ-মাই চায়, কিন্তু ছেলেকে দিয়ে মুনফার আশা কোন বাপ-মা করে। তা ছাড়া, ছেলেকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। স্বামী না-থাকলে হিন্দু স্ত্রীলোকের কোনো ভরসাই নেই এ-জগতে। ছেলে যদি করে, ভালো; কিন্তু না যদি করে? হৃষীকেশবাবুর মনে রীতিমত কষ্ট হ'লো, সন্তানকে মা থেকে এ-রকম বিচ্ছিন্ন করে' ভাবতে, তবু তিনি শেষ পর্য্যন্ত তা-ই ভাবলেন। শেষ পর্য্যন্ত, জীবনের ছুটো আলাদা স্রোত, ছুটো আলাদা স্বার্থ। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কোনো ছু'জন মানুষেরই সম্পূর্ণ এক স্বার্থ নয় জগতে। স্বামী যার জন্যে কিছু রেখে না-যায়, আশে-পাশে তার যতই থাক্, কেউ নিঃস্ব নয় তার মত। ছেলে-মেয়ের সুখের জন্য অবাধে অজস্র খরচ করবার সময় স্ত্রীর কথাটাও বোধ হয় একবার ভাবা দরকার। ছেলে দাঁড়াবে নিজের পায়ে, মেয়ের বিয়ে হবে: স্ত্রীর আর-কেউ থাকবে না, আর-কিছু থাকবে না।

কথাটা এমন স্পষ্ট, এমন নির্মম করে' হৃষীকেশবাবু আগে কখনো ভাবেননি। মনটা ভারি হ'য়ে গেলো তাঁর।

'ইন্সিয়োরেন্সের টাকাটা অমনি থাক্—সত্যি, তা-ই ভালো। মেয়ের বিয়ে যদি হবার হয় তো এমনি হবে।'

'দরকার হ'লে আনবে বইকি', খুব সহজ সুরে বিজয়া বললেন। 'কিন্তু দরকার হবে না, দেখো।'

পারিবারিক

হঠাৎ একটি বাচ্চা-ঝড়ের মত পিণ্টু ঢুকলো ঘরে পরনে সার্টের উপর দিয়ে খাকি হাফ-প্যাণ্ট্, মুখ টকটকে লাল রোদে ঘুরে-ঘুরে। দম নেবার সময় না-নিয়েই বললে: 'মা, আট আনা পয়সা দাও তো শিগগির।'

'পয়সা! পয়সা দিয়ে কী করবি?'

'দাও শিগগির, দেরি কোরো না।'

'কোন্ রাজ্যি ঘুরে এলি রে দুষ্টু? এখন আবার কোথায় যাওয়ার মৎলব?'

'বায়োস্কোপে যাবো—লরেল-হার্ডি। শিগগির—তিনটে বাজতে বেশি দেরি নেই।'

বিজয়া শক্ত হ'য়ে গিয়ে বললেন: 'রোজ-রোজ বায়োস্কোপ দেখার জন্যে পয়সা পাবিনে। যা, ভাগ্।'

'ইস, রোজ নাকি? সেই তো গেলো শনিবার গেছলাম—'

'আবার একমাস পরে যাবি। যা—কিছুতেই পয়সা পাবিনে আজ।'

মা-র আঁচল ধরে' টেনে পিণ্টু বললে: 'দাও না মা—আচ্ছা, আট আনা না-ই দিলে, চার আনা দাও। কোথায় তোমার চাবি? দাও আমি খুলে নিচ্ছি।'

এক ঝটকায় আঁচলটা সরিয়ে নিয়ে বিজয়া বললেন: 'পালা শিগগির, বলছি। পাবিনে আজ পয়সা, কিছুতে না।'

পিণ্টুর মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গেলো। অন্যদিকে তাকিয়ে বিজয়া বলতে লাগলেন: 'এ ছেলেটাই কি কম পয়সা

ওড়ায় নাকি! খালি বায়োস্কোপ আর বায়োস্কোপ—কী যে নেশায় পেয়েছে—'

'আহা, দিয়ে দাও না ওকে চার আনা', ঘুমে প্রায় জড়িয়ে-আসা চোখ মেলে হঠাৎ হৃষীকেশবাবু বলে' উঠলেন।

বিজয়া খাট থেকে নেমে হাত-বাক্স খুলতে-খুলতে বললেন: 'কে কাকে আহ্লাদ দিয়ে-দিয়ে নষ্ট করে সেটা মনে রেখো।'

পয়সা নিয়ে পিণ্টু লাফাতে-লাফাতে চলে' গেলো।

নয়

'দি পাইন্‌স্‌, শিলঙ
৭ মে

'প্রীতিভাজনেষু,

আপনি চিঠি লিখতে বলেছিলেন ; দেখছেন তো, সে-কথা একেবারে ভুলিনি। তবে এখানে এসেই যে লিখিনি তার অনেক কারণের মধ্যে এটাই প্রধান যে আমার মনে ক্ষুদ্র একটি আশা বাসা বেঁধেছিলো যে আপনিই হয়-তো আগে লিখবেন। সে-আশার বাসা সম্প্রতি ভেঙেছে। (পারিবারিক বৃক্ষের আশ্রয়ে বন্ধুদের কি এমনি করে' ভুলতে হয় ?) এখন সেই শূন্য বাসায় আর-একটি আশা-শাবক উঁকিঝুঁকি মারছে : এ-চিঠির উত্তর হয়-তো ঠিক সময়ে পাবো। হোপ্‌ স্প্রিংস্‌ ইটর্নল ইত্যাদি।

জানেন, সেদিন শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমার আশা ছিলো (আবার আশা ! প্রমথ চৌধুরী হ'লে বলতেন এত আশাআশি দেখে হাসাহাসি ছাড়া উপায় থাকে না)—আশা ছিলো যে আপনি হয়-তো আসবেন। দেখতে পাচ্ছিলুম আপনাকে, কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে দ্রুত পায়ে বিস্রস্ত দৃষ্টিতে প্ল্যাটফরম দিয়ে আসছেন, এদিকে ঘণ্টা বুঝি বাজে। এদিকে

পারিবারিক

ঘণ্টা বাজলো, গাড়ি ছেড়ে দিলো, আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই রইলুম, দমদম যখন এসে গেলো তখন খেয়াল হ'লো। বুঝতে পারলুম আপনি আর এলেন না, অগত্যা মার্ক টোয়েনের বই খুলে স্বরু করে' দিলুম পড়তে। বড় মজার বই ইনোসেণ্ট্স্ অ্যাব্রড—পড়েছেন ?

আচ্ছা, শিলঙ-যাত্রা না-হয় না-ই করেছিলেন, সী-অফ্ করতে তো আসতে পারেন ইষ্টিশানে ? ভাবখানা এই, যেন কতদিনের জন্য কত দূর দেশেই যাচ্ছি। তা দূর মন্দই বা কী; আর দেখা তো হবে আবার সেই কলেজ খুললে, কত দেরি তার। আপনি এলে আমি একাই খুসি হতাম না: বাবা খুসি হতেন, মা খুসি হতেন, টপ্সি খুসি হ'তো। টপ্সির কথা শুনে পাছে আপনার মানহানি হয় সেইজন্যে বলে' রাখছি যে টপ্সি যাকে-তাকে পছন্দ করে না; ওর ক্রিটিকল ফ্যাকলটি আমাদের ইংরিজির প্রোফেসর ডক্টর ডাট্-এর চেয়েও বেশি; ওর ভালো নজরে পড়া, আমি বলবো, দস্তুরমত বিরল সৌভাগ্য।

তারপর—আপনি কেমন আছেন ? ঢাকা জনপদটি কেমন ? দেখবার সৌভাগ্য হয়নি কখনো। এই লম্বা দিনগুলো কী করে' কাটান ? ডেস্পরেট হ'য়ে ডক্টর ডাট্-এর অনুমোদিত বইগুলোই পড়তে স্বরু করে' দেননি, আশা করি ? আমি তো ভেবে পাইনে মানুষ কখন্ এত পড়ে, আর পড়ে'ই বা কী সুখ পায় ? সুখটা কি পড়বার ? না, এত-এত বই পড়েছি সে-কথা ভাবতে পারার—লোককে জানাতে পারার ?

আমার কথা যদি জানতে চান, এখানে এসে লাগছে ভালো। আমি আর টপ্সি খুব বেড়াচ্ছি। আমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতুম তাহ'লে

অনেকগুলো পাতা প্রকৃতি-বর্ণনায় ভরিয়ে দিতে পারতুম; কিন্তু আমি এখানে বেশ আছি এবং আপনি কেমন আছেন জানতে খুব উৎসুক এ-ছাড়া আর বিশেষ-কিছু বলবার মত মনে পড়ছে না যেহেতু আমি নিতান্তই আপনার অযোগ্য সহপাঠিনী—

'মায়া।'

'—লারমিনি ষ্ট্রিট
পোঃ উয়ারি, ঢাকা
১০ মে, রাত্রি

'সুচরিতাসু,

এই গরমে বৃষ্টির ছোট পশলার মত, আপনার চিঠি। পশলাটি বড়ই ছোট, এই যা আপশোষ। লিখতে-লিখতে হঠাৎ অন্য-কিছু মনে পড়ে' গিয়ে উঠে গেছলেন বুঝি? এখানে এসে যা সুখে আছি, বলবার নয়। সকালে উঠে তা-না-না-না, তারপর খাওয়া, ঘুম; বিকেলে আর-এক প্রস্থ তা-না-না-না; রাত্রে খাওয়া, ঘুম। এ-হারে এগোতে থাকলে গোলগাল রসগোল্লার মত চেহারা নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারবো, এই আশা আছে মনে। বই কতগুলো এনেছিলাম—আজকালকার পকেট-জ্ঞানসমুদ্র গোছের গোটাকয়েক ভল্যুম—সেগুলো বাক্স থেকেও খোলা হয়নি। জীবনের নানা রহস্যের, মানব-সভ্যতার নানা বৈচিত্র্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে সম্প্রতি আদৌ প্রলুব্ধ হচ্ছি না; নীলবসনা সুন্দরী কি দেবদাস পরিণীতা গোছের বই হাতের কাছে পেলে পড়া যেতো বরঞ্চ:

অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা নাকি একটা মহৎ গুণ। অন্তত, অবস্থার স্রোতে গা ঢেলে দেয়াটা যে সুখের, সেটা ঠিক। সম্প্রতি সেই সুখে আকণ্ঠ ডুবে আছি।

সেদিন আপনাকে সী-অফ্ করতে যাইনি—ইচ্ছে করে'ই। বুকের মধ্যে ঈর্ষার সবুজ সাপকে আরো খাদ্য দিয়ে মোটা করে' তুলে লাভ নেই। আমার সম্বন্ধে আপনি নিজস্ব ও পারিবারিক যে-শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। নিজের উপর শ্রদ্ধা হচ্ছে রীতিমত। এখানে এসে ক্রমশই সংগ্রহ করছি যে আমাকে দিয়ে এ-জগতে কখনোই কিছু হবে না: এখন শুনলাম এবারের ছুটিতে আমি শিলঙ পাহাড়ে গেলে তিনটি মানুষ ও একটি কুকুর খুসি হ'তো। এবং তিনটি মানুষ ও একটি কুকুরকে একযোগে খুসি করতে পারা এ-জগতে কম কৃতিত্ব নয়।

সকলকে দিয়ে সব হয় না: কথাটা অতি পুরোনো ও অতি সত্য। এমন মানুষও হয় যাকে দিয়ে কিছুই হবার নয়। যথা, আমি। আমি আই-সি-এস্ হ'য়ে বাঙলা নভেল লিখবো না, পোলিটিকাল কয়েদি হ'য়ে খবরের কাগজের মারফৎ দেশবাসীকে 'বাণী' শোনাবো না, প্রতি সপ্তাহের আনকোরা বিলিতি বুলি চটকে মূর্ত্তিমান কালচার হ'য়ে উঠবো না, এমনকি, বাবড়ি চুল আর ফর্সা রঙের জোরে সিনেমা-অভিনেতা হ'য়ে এক পয়সার সাপ্তাহিকে ছবি ছাপিয়ে যে জীবন ধন্য করবো, এমন আশাও নেই। ঘুরবো আড্ডা থেকে আড্ডায়, বড়লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখার চেষ্টা করবো, বড়লোকের ভালো-ভালো কথা নিজের বলে' চালাবো অন্য জায়গায়, কেউ বোকা বলবে না, সবাই ভালোমানুষ বলে' জানবে, কেউ

বিশেষ আমলে আনবে না। ভেবে দেখতে গেলে, এ-রকম জীবন মন্দ নয় নেহাৎ। আপনি কী বলেন ?

অবিশ্যি আপনার কথা আলাদা, সমস্ত দিক দিয়েই আলাদা। আমাকে আপনার বন্ধুতা দান করে' আপনি আমার প্রতি দয়াই প্রকাশ করেছেন। আপনার বাড়িতে যাঁদের আনাগোনা, তাঁদের সঙ্গে নিজেকে একবার তুলনা করলেই সেটা বুঝতে পারি। কৃতী হবার জন্যেই তাঁদের জন্ম। আমি যদি ভেঙ্কটরমনের মত টেনিস খেলতেও পারতুম, তাহ'লেও আপনার এ-করুণা সার্থক হ'তো। আমি অবিশ্যি নিজেকে এই বলে' প্রবোধ দিই যে কোনো-কোনো অবস্থায় টেনিসখেলোয়াড় হবার চাইতে দর্শক হওয়াই ভালো : কেননা আপনি যখন টেনিস খেলেন তখন কী সুন্দর যে আপনাকে দেখায় সেটা খেলোয়াড়দের চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে না। তারা খেলা দেখে, আমি আপনাকে দেখি।

আর লিখতে পারছি না। পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নোত্তর ও অর্থ প্রার্থনা করে' পিতৃদেবকে চিঠি ছাড়া জীবনে কিছু লিখেছি বলে' মনে পড়ে না। এক দৌড়ে এতখানি এসে হাঁপিয়ে পড়েছি। তা ছাড়া ঘুমও পেয়েছে।

'সুমন্ত্র'

দি পাইন্‌স্‌, শিলঙ

১৫ মে

বিনয়াবতারেষু,

ইচ্ছে করলেই আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিনয় করতে পারতুম, কিন্তু আজ কী হয়েছে তা আগে শুনুন। কয়েকদিন যাবৎই একটা বেড়াল

পারিবারিক

ঘুর-ঘুর করছে আমাদের বাড়িতে—কী বলবো, ঠিক পেত্নির মত দেখতে। এমনিতেই আমি চু'চক্ষে বেড়াল দেখতে পারিনে; তার উপর একেবারে ঠিক যদি পেত্নির মত দেখতে হয় কেমন লাগে বলুন তো? আমি ভুবনকে বলি মারো, বীর বাহাতুরকে বলি কাটো, আলতাফকে বলি পাকড়ো, তা ও উৎপাত দূর হয় না কিছুতেই। আজ হয়েছে কী, আমরা খেতে বসবো, দেখি, কখন্ থেকে শ্রীমতী গুটিসুটি হ'য়ে বসে' আছেন টেবিলের তলায়। রাগে শরীরটা জ্বলে' গেলো। ডাকলুম, টপ্‌সি! টপ্‌সি ছুটে এলো তাড়া করে', কিন্তু কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে সুরু করলো চীৎকার। ভাবতে পারেন, বেড়ালটার এতটুকু গ্রাহ্য নেই; পিঠ ফুলিয়ে চুপচাপ বসে' চোখ মিটমিট করতে লাগলো। আমি বললুম: টপ্‌সি, তুই একটা আস্ত কাওয়ার্ড! অত বড় শরীরটা নিয়ে অতটুকু বেড়ালের কাছে যেতে পারিসনে! ধিক্ তোকে। এই না বলে' দিলুম ওকে ঠেলে টেবিলের তলায়। তারপর একটা ফোঁ—ও—স্‌স্‌স্, সঙ্গে-সঙ্গে টপ্‌সির তীব্র চীৎকার ও তারপর বেড়ালরূপী পেত্নির দে ছুট্। আমি বললুম: কেমন, এইবার কেমন, আর আসবি! বলে' টপ্‌সিকে একটু আদর করতে গিয়ে দেখি—ওমা! এ কী! রক্ত এলো কোত্থেকে? টপ্‌সি মাথা নিচু করে' চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর তার কান থেকে রক্ত পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা। দস্যি ডাইনি রাক্ষুসি বেড়াল। যাদের নখ চামড়ার ভিতরে ঢাকা, কক্ষনো যেন তাদের কেউ বিশ্বাস না করে।

তারপর খেয়ে-দেয়ে বাবার মোটা লাঠিটা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে এলুম, কোথাও দেখা পেলুম না রাক্ষুসিটার। তারপর এই তো আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি—মোটা লাঠিটা হাতের কাছেই আছে। আবার আসুক্

না, আস্ত রাখবো না ওকে। টপ্‌সি এখন ভালোই আছে—আমার পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেচারা! ঐ পুঁচকে বেড়াল কিনা একটা খাস টেরিয়রকে দিব্যি মেরে গেলো। তা কুকুর ও-রকম মারতে পারবেই বা কেন, কুকুর তো ছোটলোক নয়।

সম্প্রতি রাস্তায় একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হচ্ছে, তার নাম ন্যান্সি। আয়া তাকে ঠেলে নিয়ে যায় পেরাম্বুলেটরে, আর সে বসে' থাকে আপেলের মত টুকটুকে গাল আর নীল্‌চে জোলো-জোলো চোখ নিয়ে বোধিসত্ত্বের মত গম্ভীর মুখ করে'। তাকে যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার নাম কী? সে বলে নান্‌থি। যদি বলি, তোমার বাড়ি কতদূর? সে বলে নান্‌থি। আর যদি বলি, তোমার মা কোথায়? তাহ'লেও সে বলে নান্‌থি। প্রায় হ-য-ব-র-ল-র তকাইর মত। ভারি মজা লাগে।

১৬ মে

কাল আর-একবার বেড়ালটার খোঁজ করতে উঠে গেছলুম, চিঠি শেষ করা হয়নি। রাক্ষুসিটা আজ আবার এসেছিলো, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো রান্নাঘরের কাছে, বীর বাহাদুর আর আলতাফ দু'জনে মিলে খুব মেরেছে ওকে। খুব মানে অবিশ্যি কিছুই নয়, দু'এক ঘা পড়তে-না-পড়তেই চার পা তুলে চম্পট। অসভ্য জানোয়ার! কাল কুকুরটার রক্ত বের করে' দিলি, আজ না-হয় ধীরে-সুস্থে একটু মারই খা।

আপনার চিঠি দু'বার তিনবার পড়েছি। ঐটুকু লিখেই ঘুম পেয়ে গেলো! নিজের অকর্মণ্যতার হাতে-হাতে প্রমাণ—নাকি? নিজেকে এ-রকম ওয়ার্থলেস বলে' ভাবতে লাগে মন্দ না—দিব্যি রোমান্টিক।

আমিও মাঝে-মাঝে ও-রকম করে' ভাবি। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারিনে, নিজেরই হাসি পেয়ে যায়। কিছু করতেই হবে নাকি? কিছু হ'তেই হবে নাকি? আমি আছি তো আছি। আপনি আছেন তো আছেন। আবার কী? এই যে টপ্‌সি এত চ্যাঁচাচ্ছে, এত লাফাচ্ছে, আর এত খেলছে এত শুঁকছে এত ধুঁকছে—ও কী করছে? কিছুই করছে না, কিন্তু সবই করছে। ওকে তো করতে হয় না কিছুই: ও যে আছে এটাই খুব চমৎকার।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও আমার সখ ছিলো এরোপ্লেন চালাতে শিখবো। সে-সখ যে এখন আর নেই তাতেই প্রমাণ হয় যে ইচ্ছেটা খাঁটি নয়। এখন দেখছি ও-সব বৃহৎ কাণ্ডকারখানার কিছুই দরকার করে না—জীবনটা এমনিতেই বেশ।

এখানে ভারি ভালো পাইনের হাওয়া। আমার আগে অনেকেই বোধ করি এ-মন্তব্যটা করে' গেছেন: কিন্তু যেহেতু অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে নতুন, মন্তব্যটাও নতুন মনে হচ্ছে। এ-অঞ্চলে মোটরের রাস্তাগুলো চমৎকার—কিন্তু সে-কথাও বুঝি পড়েছেন 'শেষের কবিতা'য়। হায়রে, লেখকদের জ্বালায় কোনো কথা যদি বলবার উপায় থাকতো!

'মায়া

'পুঃ—মার্ক টোয়েনের বইখানা আমার এত বেশি ভালো লেগেছে যে আপনাকে না-পাঠিয়ে পারলুম না। দিবানিদ্রার ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হোক্ অন্তত।

'বইখানা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। পরে পাঠাচ্ছি। চিঠি লিখবেন।'

পারিবারিক

শিলঙ

১৭ মে

'বন্ধুবরেষু,

আজ হঠাৎ বৃষ্টি এলো। বেশ একটু ঠাণ্ডা নেমেছে; বসে' আছি শার্সি-আঁটা জানলায় শালমুড়ি দিয়ে। আকাশটা মন-মরা, বাতাসে শীত, গাছ-পালা ঘোলাটে। ভালো লাগছে না। কী-করি কী-করি গোছের একটা খুঁতখুঁতানি মনটাকে কামড়ে ধরেছে। এ-অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে অনেক শুনেছি: ভয়ে মরছি, এমনি চলবে না তো দিনের পর দিন! কোন্ সুখের আশায় যে মানুষ এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় আসে! যখন দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির কারখানার অদৃশ্য কারসাজির উপরেই নির্ভর করছে আমাদের সমস্ত সুখ। কী একটু ডিপ্রেসন হ'লো বে অব বেঙ্গলে ঈশ্বর জানেন, তার ফলে এলো বৃষ্টি ঝমঝম, আমাদের সব উৎসাহের উপর পড়লো মেঘের ভিজে কম্বলচাপা।

আজ কিছু করবার নেই, কিছু ভাববার নেই; টপ্‌সি সকাল থেকে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ওর কম্বলখানার উপর গোল হ'য়ে। মানুষের উপর এইখানে ওর মস্ত জিৎ। যখনই দেখলো বেড়াবার খেলবার সুবিধে হবে না, দিলে লম্বা ঘুম মনের শান্তিতে। মেনে নিলে দুরবস্থাটা অনায়াসে। আমরা ও-রকম করে' ঘুমোতে পারিনে: কিছু ভালো না-লাগলেও, কিছু করবার না-থাকলেও জেগে থাকি, হাঁটা চলা করি, মন-খারাপ করি। এখন শুধু মনে হচ্ছে যদি আর কেউ থাকতো, এই জানলার ধারে মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসে' গল্প করতে পারতুম, আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে, মাঝখানে চায়ের সাদা পেয়ালার মুখে উঠতো সাদা

যোঁয়া, তারপর হয়-তো বৃষ্টি থামতো, ঝিকমিকিয়ে উঠতো রোদ, অনেকক্ষণ গল্প করে' হঠাৎ চুপ করে' যাওয়াটাও যেন তেমনি।

আশাটা বিশেষ কিছু নয়, এর চেয়ে অনেক বড়-বড় আশা মানুষ করেছে—এবং পূর্ণ করেছে, শুনেছি। কিন্তু সম্প্রতি আমার এই অতি ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না; এবং এ-চিঠি যদি আরো লিখতে থাকি, তাহ'লে এই মন-খারাপের হাওয়া থেকে এমন-সব কথা সম্ভবত লিখতে থাকবো, যা নিয়ে দেখা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন। অতএব, হে বন্ধু, বিদায়।

আপনি কেমন আছেন?

'মায়া।

'মার্ক টোয়েনের বই পাওয়া গেছে, কিন্তু কোথায় কাঁচি কোথায় সুতো কোথায় ব্রাউনপেপার—এই বাদ্‌লার দিনে সহজ নাকি বই প্যাক্‌ করা! যদি মনের ইচ্ছার সঙ্গে এই সব স্থাবর বস্তু স্থান থেকে স্থানান্তরে চালান করা যেতো তাহ'লে আর কথা ছিলো না।

চিঠি লিখবেন লম্বা করে'।

—লারমিনি ষ্ট্রিট
উয়ারি, ঢাকা
১৯ মে, রাত্রি

'প্রীতিভাজনাসু,

লম্বা চিঠি লেখবার হুকুম করেছেন; কাল আপনার চিঠি পেয়ে তেমনি একটা ঝোঁক হয়েছিলো, সত্যি বলতে। কালই যদি লিখে ফেলতুম, তাহ'লে ধাঁ করে' লেখা হ'য়ে যেতো, তারপর বসে'-বসে' ফের আপনার

চিঠি আসবার দিন গুণতে পারতুম। কিন্তু আজ আবার আপনার চিঠি পেয়ে আমার ভিতরটা যেন বিষম একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুলিয়ে উঠছে: কাল যে-সব ভালো-ভালো কথা মনে-মনে সাজিয়েছিলুম, কোথাকার একটা দস্যি হাওয়া এসে সেগুলোকে এক দমকে ওলোট-পালোট করে' দিয়ে গেলো।

একটু বৃষ্টি হয়েছে বলে' আপনি তো কত মন-খারাপ করেছেন। এদিকে আমরা তাকিয়ে আছি হাঁ করে' আকাশের দিকে—হা-মেঘ হা-মেঘ ছাড়া কারো মুখে কথা নেই, কিন্তু আকাশটা সমস্তদিন পাৎলা শিষের পাতের মত ধ্বক্‌ধ্বক্ করে' জ্বলছে, আর রাতগুলো এমন চাপা যে নিঃশ্বাস পড়ে না। কখনো যদি একটু হাওয়া দেয়, মনে হয় ডিরেক্ট স্বর্গ থেকে চলে' এলো ইন্দ্রাণীর অঞ্চল-তাড়িত হ'য়ে। কাগজ পড়ে' জানা গেলো, মনসুন আসবার তারিখ পার হ'য়ে গেছে—রাস্তার মধ্যিখানে মনসুন বেচারার কী অপঘাত ঘটলো তা-ই ভাবছি। কষে' রাগ করে' আলিপুর আপিসের উদ্দেশ্যে কেউ একটা চিঠি লিখছে না আনন্দ-বাজারে, এতে অবাক না-হ'য়ে পারছিনে। আপনাকে বলিনি বাঙলা কাগজের সেই সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা? সেবার হাওয়া-আপিসের ডক্টর সেন বুঝি গেছলেন এক হিমালয়-অভিযানের সাহায্যে। তা-ই নিয়ে বঙ্গ-জন-গণ-মনের সেই প্রতিনিধি যথেষ্ট ইন্‌ডিগ্‌নেশন সহকারে বলেছিলেন—আমরা কলিকাতাবাসীরা গরমে পুড়িয়া মরিতেছি, এদিকে ডক্টর সেন কী করিতেছেন? তিনি পাহাড়ে গিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন। সত্যি, কী অন্যায়! সেন সাহেবের আপিসে বৃষ্টি তৈরির সব মাল-মশলা মজুত, তাতে চাবি দিয়ে তিনি কিনা পালালেন পাহাড়ে!

কিন্তু জানেন, আপনার যে মাঝে-মাঝে মন-খারাপ হয়, এটা জেনে মনের মধ্যে ভারি একটা আরাম পাচ্ছি। আমার যেন ধারণা হ'য়ে গেছল আপনি সব সময়েই হাসিখুসি ঝকঝকে ফিটফাট—যাকে বলে টিপটপ কণ্ডিশন। সেটা দেখতে ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা কিছু সৌখিন—পোষাকি, কী বলেন? আপনার সেই পোষাকি মানুষের সঙ্গেই আমার পরিচয়। তাকে যতই ভালো লাগুক, চলতে হয় তাকে সমীহ করে'। কিন্তু এই যে আপনি লিখেছেন, মনটা আজ ভালো লাগছে না, এতে যেন এক ঝলকে আর-একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেলো। সে-মানুষ আটপৌরে, সে-মানুষ প্রতিদিনকার ঘরোয়া জীবনের চিরকালের চেনা। যার মন-খারাপ লাগে, এবং সে-কথাটা যে স্বীকার করে, সে তখনই অনেকটা কাছে এসে যায়—তাকে তখনই চিনতে পারি আমারই মত হাজার সুখে-দুঃখে আশায়-ব্যর্থতায় জড়ানো একজন মানুষ বলে'। যদিও সে পরমুহূর্তেই সাবধান হ'য়ে যায়, পাছে পরে তাকে সইতে হয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

হায়রে, এখানে আমার যদি একদিন একটু মন-খারাপও হ'তো। সেটা একটা পজিটিভ অবস্থা, সেটা বিশেষ একটা-কিছু: আমার এই ঘামে আর ঘুমে হাঁপিয়ে-ওঠা লম্বা দুপুরের শূন্যতা থেকে মস্ত রেহাই সেটা। ভাবছি, সাইকলজির যে- সংক্ষিপ্ত সার আমার বাক্সর তলায় অবস্থান করছে সেখানাই টেনে বার করি। পড়তে-পড়তে হয়-তো দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। এবং সেই দৃষ্টির জোরে নিজের ভিতরটা দেখতে-দেখতে এমন মুগ্ধ হ'য়ে যাবো যে বাইরের জিনিসের কোনো অর্থই আর থাকবে না। কিন্তু যদি মুগ্ধ না হই? যদি আতঙ্কে শিউরে উঠি?

সেইজন্যেই, মায়া দেবী, সেইজন্যেই সাইকলজির বই আমার খোলাই হচ্ছে না। পড়ে' থাক্ বই, নিজের মনের মধ্যে কী আছে, তলিয়ে দেখে লাভ কী? শান্ত শিষ্ট ভদ্র চেহারা নিয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে দিনগুলো কেটে গেলেই হ'লো। কিন্তু মেজাজটাও সব সময় ঠাণ্ডা রাখা যায় না, এই যা আপশোষ। আচ্ছা, আপনি তাস খেলেন? যদি তাসখেলার প্রতি আপনার এমন একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা জন্মে' থাকে যে তার চাইতে ত্বপুরবেলায় পুরোপুরি ত্ব' ঘণ্টা ঘুমোনোও ভালো মনে করেন, আর কেউ যদি আপনাকে জোর করে' সেই তাসখেলাতে বসাতে চায়, তাহ'লে আপনার কেমন লাগে? আপনি দয়া করে' মার্ক টোয়েনের বই পাঠাতে চেয়েছেন: না-পাঠালেন। চাইনে মজার বই, চাইনে হাসতে—বিশ্বাস করুন, এবারকার এই গ্রীষ্মের ছুটিতে আর কিছুই চাইনে—যদি মাঝে-মাঝে আপনার চিঠি পাই। কেমন এইবার? দেখলেন তো, অভাজনকে প্রশ্রয় দিলে কেমন হয়? আর ত্ব'দিন পরে হয়-তো চিঠি না-পেলে রাগই করবো। ভালো চান তো এখন থেকেই সামাল দিন।

সামনের চিঠিতে জানাবেন বৃষ্টি কেটে দিয়ে ঝিকমিকিয়ে রোদ উঠেছে কিনা আকাশ ভরে'। অনেকবার বৃষ্টি পড়বে, অনেকবার রোদ উঠবে বৃষ্টির পরে: হবে না শুধু মুখোমুখি চেয়ারে বসে' ত্বজনে গল্প করা, আর সমস্ত গল্পের পরে সোনায়-ভরে'-ওঠা সেই চুপ-করে' থাকা।

টপ্‌সি কেমন আছে? তাকে আমার ভালোবাসা দেবেন।

'সুমন্ত্র।

'আচ্ছা, আপনি পেন্সিলে চিঠি লেখেন কেন? আর এমন শক্ত পেন্সিলে? আঙুল ব্যথা করে না? এত হালকা হ'য়ে লেখা পড়ে—

প্রয়ই মাঝে-মাঝে কথা বুঝতে পারিনে—প্রথমটায়। পরে অবিশ্যি বার-বার পড়ে' অনেক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে উদ্ধার করি—আপনার চিঠি থেকে একটি ছোট কথা হারাতেও আমি রাজি নই।'

'শিলঙ

২১ মে

'সুমন্ত্রেষু,

নামের পর বহুবচন প্রয়োগ করাটা কেমন জানিনে; কিন্তু মানুষের পক্ষে বহু চরণের অধিকারী হওয়ার চাইতে বহু নামের ভাগী হওয়া বরঞ্চ সম্ভব; আর, এক হিসেবে এটা বলা তো খুবই সঙ্গত যে আপনি একজন সুমন্ত্র নন, অনেকগুলো সুমন্ত্র। জিকল হাইডের বিভাগটা চমকপ্রদ হ'লেও কিছু গায়ে-পড়া: আসলে প্রতি মানুষের মধ্যে জিকল হাইডের অসংখ্য স্তরবিভাগ পাশাপাশি লাফালাফি ছাপাছাপি করছে। যদি জিকল-হাইডরূপী সুস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন যুগল-কক্ষ নিয়েই মানুষের মনের রচনা হ'তো, তাহ'লে কী সহজই না হ'তো জীবন!

খুব বিজ্ঞের মত কথা বললুম: এবার এটা শুনুন। প্রতিবারই বেড়াতে বেরোবার সময় যখন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হ'তে থাকে, দুটি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে আমার মন আশঙ্কায় কণ্টকিত হ'য়ে থাকে। কেবলই ভয় হয় ফেলে' যাবো—হয় টুথ্‌ব্রাশ, নয় ফাউণ্টেনপেন, নয় দুই-ই। সেইজন্যে শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ও-দুটি জিনিস আমি চোখের সামনে কোথাও ফেলে রাখি, রওনা হবো-হবো এমন সময় তাদের কুড়িয়ে নিই আর কোথায় জায়গা না হয় আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। নাম 'ভ্যানিটি' ব্যাগ হ'লেও জিনিসটি কত যে কাজে লাগে ভাবতে পারেন না।

আপনাদের জামার পকেটকে যদি ভ্যানিটি পকেট বলি তাহ'লে কেমন হয়? এবারেও, দেখুন, সরল বিশ্বাসে ও-দুটি জিনিস ড্রেসিং টেবিলের উপরে রেখে টপ্‌সির ও নিজের প্রসাধন সমাপন করছি—শেষ মুহূর্তে আমার সেই চিকচিকে কালো, ভায়োলেট কালি ভরা কলম এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে কে জানতো! এখানে এসে দেখি নেই, নেই তো নেই। মনকে সান্ত্বনা দিলুম—থাক্‌গে, কী-ই বা হ'তো কলম দিয়ে, টুথ্‌ব্রাশটি যে দয়া করে' এসেছেন এইজন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তারপরে যখন আপনাকে চিঠি লেখবার কথা মনে হ'লো তখন খোঁজ-খোঁজ সারা বাড়ি—আর সারা বাড়ি খুঁজেও একটি এক্‌সট্রা-হার্ড পেন্সিল ছাড়া আর-কিছু আবিষ্কার করা গেলো না। এ-যন্ত্রটি লেখবার নয়, আঁকবার: তবু এ অনায়াসেই প্রমাণ করলে যে অসময়ে একে লেখনী রূপেও চালনা করা যায়। ইতি পেন্সিল পর্ব।

এক হিসেবে তবু ভালোই হ'লো; তবু তো আক্ষরিক অস্পষ্টতার জন্যে আপনি একাধিকবার আমার চিঠিগুলো পড়েন! যদি হাতে থাকতো কলম তবে সেই ঝকঝকে কালির আঁচড় সুবোধ্য হ'তো প্রথম দর্শনেই, এবং তার অনুশীলন প্রথম পাঠেই শেষ হ'তো। সুতরাং, যদিচ চেষ্টা করলে কিছু কালি-কলম সংগ্রহ করা অসম্ভব নয় আমার পক্ষে, তবু এই পেন্সিলের মায়া যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিনে। আঙুল ব্যথা করে বইকি—তা করুক্‌।

বৃষ্টি কেটে গেছে। এখানকার বৃষ্টিটা যেমন বিশ্রী, তার কেটে-যাওয়াটা তেমনি সুন্দর। কে একজন অসম্ভব খুসি হ'য়ে সমস্ত আকাশ ভরে' হেসে ওঠে। তারপর কোথায় জুতো কোথায় গায়ের জামা কোথায়

তোমাকে আমরা রেখে যাচ্ছি এই নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়। যদি হাত পিছলে পড়ে' যাও, নিচে অতল মৃত্যু। আর যদি দৈবাৎ কেউ তোমাকে উদ্ধার করে তো প্রাণ নিয়ে যেয়ো ঘরে ফিরে, আমাদের আর ঘাঁটাতে এসো না। বেচারা ইংরেজ দু'হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ঝুলে রইলো সমস্ত রাত, একটুর জন্যে সে পা তুলে উঠতে পারে না, একটুর জন্যে পা বাড়িয়ে পায় না ওদিকের নিরাপদ আশ্রয়। এমনি করে' অন্ধকার রাত কেটে গেলো, তারপর ভোর যখন হয়-হয়—মনে-মনে একবার যীশুর নাম নিয়ে দিলে ছেড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে পড়লো হুমড়ি খেয়ে এক বালুর ঢিবির উপর। ভোরের আলোয় দেখা গেলো যে তার ঝুলন্ত পা দুটোর ইঞ্চিকয়েক নিচেই ছিলো বালুর নরম বিছানা। বাস্তবিক, চীনেরাই প্রকৃত সভ্য জাত।

টপ্‌সি আছে ভালো। বেজায় দস্যি হয়েছে এখানে এসে। কোথায় থাকে কী করে, খোঁজই নেই শ্রীমানের। কেবল খাওয়ার সময়ে ঠিক এসে হাজির মূর্তিমান জঠরানল। কী করে' টের পায়? দার্শনিকদের উল্লিখিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি এই? আমরা যখন হাত থেকে মুখে খাদ্য চালান করি, এমন অনিমেষ নয়নে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে একটা দেখবার জিনিস! খাওয়া হ'লো তো আবার ছুট! হয়-তো বাড়ির সামনেকার লন্-এ নিরীহ পাখিগুলোকে তাড়া করছে, হয়-তো রান্নাঘরেরর দরজায় উঁকি দিয়ে পরবর্তী ভোজনের আয়োজন আসছে পর্য্যবেক্ষণ করে'। যদি ডাকতে পারলুম—টপ্‌সি! টপ্‌সি! দৌড়ে ছুটে এলো হা-হা করে', ঝাঁপিয়ে পড়লো কোলে। খুব ভালো, টপ্‌সি।

আপনি কেমন আছেন সব জানাবেন।

মায়া।'

পারিবারিক

'ঢাকা

২৪ মে

'কেমন আছি বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। সে-সব থাক্। সম্প্রতি কলেজে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ আমার পক্ষে এই হ'য়ে উঠেছিলো যে সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এবং আমার এখানকার জীবন-ধারণের প্রধান আকর্ষণই এ-ই যে সপ্তাহে দু'বার আপনার চিঠি পাই। এক হিসেবে বোধ হয় ভালোই হয়েছে যে আমার শিলঙ যাওয়া হয়নি। এ-চিঠিগুলো তবে কোথায় পেতাম? কতদিন কত কথা তো হয়েছে আপনার সঙ্গে—কিছু কি মনে আছে? কিছু কি ধরে' রাখতে পেরেছি কোনোখানে? সময়ের স্রোতে ওরা গেছে খড়কুটোর মত ভেসে। কিন্তু আপনার এই চিঠিগুলো রইলো, রইলো আমার বাক্সর তলায়, রইলো আমার মনের তলায়, চুরি করে' লুকিয়ে রেখে দিলাম দস্যু সময়ের হাত থেকে ছিনিয়ে—আপনার এই যেমন-খুসি-বলা, মনে-ঢেউ-তোলা, পেন্সিলে-লেখা অপ্রস্তুত চিঠিগুলো। আপনি হয় তো জানেন না—

উঠে যেতে হয়েছিলো পিতৃদেবের তলবে। ফিরে এসে আর-কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিনে। মিথ্যা মানুষ নিজের মন নিয়ে গর্ব করে—সে-মন তো এক টুকরো মেঘের মত, আকাশের অসংখ্য হাওয়ার সখের খেলেনা। আপনার চিঠির হাওয়ায় যে-মন চলেছিলো পাখা মেলে স্বর্গের দিকে, পৈতৃক অনুশাসনের ধাক্কা খেয়ে এখন তা পাতালগামী। যেন একটা পাখা-ভাঙা এরোপ্লেন ঝাপ্টে-ঝাপ্টে ডুবছে, নিচে রয়েছে হাঁ করে' অতল কালো জল।

সুমন্ত্র।'

দশ

'তোকে শিলঙ থেকে কে এত চিঠি লেখে রে ঘন-ঘন ? মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়।'

আপিস-ঘর। মক্কেলরা আজ একটু সকাল-সকালই বিদায় নিয়েছে। হাতে আছে সময়, হৃষীকেশবাবু ডেকে পাঠালেন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। ফুটো ফুটো গেঞ্জির উপর কোঁচার খুঁট জড়িয়ে সুমন্ত্র ঢুকলো ঘরে। এবার এসে এ-ঘরে এই প্রথম তার পদার্পণ। দেয়ালের গা ঘেঁষে কাচের আলমারির সারি বিরাটকায় আইনগ্রন্থে ঠাসা ; এক-একখানা বই এক বছরের শিশুর মত ভারি। ঘড়ি টিকটিক করছে আইনজ্ঞের মুখোমুখি দেয়ালে। পিতা-পুত্রের মধ্যবর্ত্তী বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে দলিল-পত্রের ঠেসাঠেসি ভিড়। হৃষীকেশবাবুর সামনে একখানা কাগজ, সুমন্ত্র যখন ঢুকলো তাঁর চোখ ও মন তারই অধ্যয়নে নিবদ্ধ। ছেলের পায়ের শব্দ শুনে চোখ না-তুলেই তিনি বললেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ, পেশাদারি ঢঙে :

'বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সুমন্ত্র বসলো। নিজেকে শক্ত করে' নিলো ভিতরে-ভিতরে, নিলো তৈরি হ'য়ে। প্রবীণতার দৃশ্যে ঘাবড়াবে না সে, গম্ভীর বিজ্ঞতার

মুখোমুখিত্বে সে ভয় পাবে না। এমনি কাটলো খানিকক্ষণ, তারপর হৃষীকেশবাবু কাগজটা সরিয়ে রেখে চোখের চশমা নামিয়ে সুমন্ত্রর দিকে তাকালেন। হালকা সুরে বললেন :

'তোকে শিলঙ থেকে কে এত চিঠি লিখে রে ঘন-ঘন? মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়।'

এমনভাবে বললেন কথাটা যাতে স্পষ্টই বোঝা যেতে পারে এটাই আসল কথা নয়, এটা আকস্মিক প্রসঙ্গমাত্র—যেন হঠাৎ মনে পড়ে' গেলো, এমনিভাব।

সুমন্ত্র বললে : 'আমার এক বন্ধু। ওর হাতের লেখা মেয়েলি।'

'বন্ধু—কোথাকার বন্ধু?'

'কলেজের। একসঙ্গে পড়ি আমরা।'

'ও। সে শিলঙ গেছে বুঝি ছুটিতে?'

'আমিও যেতে চেয়েছিলাম সেই সঙ্গে।'

'যেতে চাওয়াটা অন্যায় হয়েছিলো তা আমি বলবো না। আর-একজনকে দেখলে ও-রকম সখ হয়ই তোমার বয়েসে! তবে কিনা তুমি এখন আর নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নও। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার বয়েসের সাধারণ ছেলের চাইতে তোমার চিন্তা করবার শক্তি অনেক বেশি। টাকা-পয়সার দিকটা এখন কি তোমার ভাবা উচিত নয়?'

'গেলে তো ওদের বাড়িতেই থাকতাম, কেবল যাওয়া-আসার খরচটা। সে আর এমন কী। এখানেও তো এলাম।'

'তুমি কি বলতে চাও সমস্ত ছুটিটা তুমি ওখানেই কাটাতে? এখানে আসতে না?'

সুমন্ত্র চুপ করে' রইলো।

হৃষীকেশবাবু তীক্ষ্ণচোখে ছেলের দিকে তাকালেন :

'মন্তু, তোমার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করে' আমি বড় দুঃখিত হয়েছি। তোমার পরিবারের প্রতি একেবারেই তোমার সহানুভূতি নেই।'

'পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?' কথাটা প্রায় সুমন্ত্রর মুখে এসে পড়েছিলো, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে :

'কী করলে তোমাদের বিশ্বাস হবে যে আমার সহানুভূতির অভাব নেই?'

হৃষীকেশবাবু ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন।

'তুমি যদি সহানুভূতি দেখাতে যেতে আরো বেশি দুঃখিত হতাম। কিন্তু প্রাণে যে তোমার এক ফোঁটা দরদ নেই সেটাই আশ্চর্য্য।'

সুমন্ত্র কিছু বললে না।

'এই একটা কথাই ধরো,' হৃষীকেশবাবু তাঁর পক্ষে আশ্চর্য্য শান্তভাবে বলতে লাগলেন। 'তুমি আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা নাও মাসে-মাসে। স্কলার্শিপ পাও কুড়ি টাকা। ষাট টাকা বাঙলাদেশে অনেক কেরানিরও আয় না। তুমি কলেজে পড়ো, থাকো হস্‌টেলে। কী করো এত টাকা দিয়ে?'

'খরচ করি,' সুমন্ত্র নিশ্চিন্তভাবে কথাটা বললে, চোখের পলক পড়লো না।

হঠাৎ টেবিলে প্রচণ্ড চড় দিয়ে গর্জন করে' উঠলেন হৃষীকেশবাবু : 'খরচ করো! কী তোমার এত খরচ! এতেও তো তোমার চলে না।

এটা-ওটার ছুতো ধরে' প্রতি মাসেই তো বেশি টাকা চেয়ে পাঠাও। গোপনে নাও তোমার মা-র কাছ থেকে। না-পেলে রাগ করতেও শিখেছো।'

সুমন্ত্র একটু চুপ করে' রইলো, পিতৃদেব আর-কিছু বলেন কিনা বোধ হয় সেই অপেক্ষায়। তারপর আস্তে-আস্তে বললে: 'কলেজের মাইনে আর হস্‌টেলেই তো তিরিশটাকা যায়।'

'আর? আর তোমার কী খরচ, শুনি?'

'আর খরচ নেই মানুষের? আমি কি পশু নাকি?'

'আর যা খরচ পাঁচ টাকাতেই হ'য়ে যাওয়া উচিত। বেশি করে' দশটাকাই ধরলুম না-হয়। আমরা যখন কলেজে পড়তুম—'

'সে-কথা বার-বার বলো কেন? তোমার সময় আর নেই, দিন বদ্‌লে গেছে—'

'তা বেশ বুঝতে পারছি। যত সব দায়িত্বজ্ঞানহীন উড়নচণ্ডী নির্বোধ—'

'বেশ, হিসেব চাও হিসেব দিচ্ছি', বেশ উচ্চস্বরেই সুমন্ত্র জবাব দিলে। 'দু'বেলা চা খাওয়া আছে, এবং খালি-খালি চা খাওয়া যায় না—'

'কত তোমাদের খাওয়ার দিকে নজর তা তো জানি! খাও তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে সাপের চর্বিতে ভাজা কুকুরের চপ্—'

'কোথায় পাবো আর! বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে মুরগির কটলেট কে আমাকে ভেজে দেবে! খিদে পায়, যা জোটে তা-ই খেতে হয়।'

'তোমার পিসে আছেন কলকাতায়, তোমার হস্‌টেল থেকে দূরও নয় তাঁর বাসা। কথা ছিলো, তুমি কলেজ থেকে তাঁর ওখানে গিয়ে বিকেলের খাওয়াটা খাবে—'

পারিবারিক

সুমন্ত্র ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, 'পরের বাড়িতে রোজ-রোজ খেতে আমার লজ্জা করে।'

'আহা—তাঁরা তো অক্ষমও নন, অনিচ্ছুকও নন। কত খুসি হয় সবাই তুমি গেলে। আর অনাদিবাবু আমাকে লিখেছেন চার মাসের মধ্যেও তুমি তাঁর ওখানে যাও না। তিনিই বুঝি একদিন হস্‌টেলে গিয়েছিলেন তোমার খোঁজ নিতে, তাও তোমার দর্শন মেলেনি।'

'ও-বাড়িতে মোটে আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না! ওরা কিনা আপন, ওরা কিনা ভালোবাসে—'

'আপন? আত্মীয়। আত্মীয় হ'লেই কি আপন হয়? আত্মীয় হ'লেই ভালো লাগতে হবে, মানুষের উপর এ কী অন্যায় জবরদস্তি!'

হৃষীকেশবাবু স্তম্ভিত হ'য়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এতটা উচ্চশিক্ষার তুমি যোগ্য নং বইয়ে-পড়া বুলি—'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝেঁকে বলে' উঠলো সুমন্ত্র: 'কাকে ভালো লাগবে আর কাকে লাগবে না, সে-কথাও কি বইয়ে লেখা থাকে নাকি? তুমিও তো কোনোদিন বই-টই পড়েছিলে।'

হৃষীকেশবাবু লম্বা নিঃশ্বাসে অনেকখানি বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

'পড়েছিলাম—কিন্তু—' হঠাৎ সমস্ত বাঁধ ভেঙে তিনি গর্জন করে' উঠলেন, 'কিন্তু এত বেশি পড়িনি যাতে তোমার মত নির্বোধ দাম্ভিক গর্দভ হ'তে পারি!'

ঝাঁ-ঝাঁ করে' উঠলো সুমন্ত্রর সমস্ত মুখ; টুকটুকে কান নিয়ে মাথা নিচু করে' রইলো সে।

'আর তোমাকে দিয়ে কত কিছু আশা করেছিলুম আমি! ভুল হয়েছিলো তোমাকে কলকাতা পাঠানোই—স্বাধীনতা তোমার সইলো না।'

সুমন্ত্র হঠাৎ বলে' উঠলো, তীব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝেঁকে: 'কেন এ-কথা বলছো তুমি? কী করেছি আমি?'

'উচ্ছন্নে যাচ্ছো—অতি অল্প কথায় এই হচ্ছে তোমার অবস্থা।'

ঝল্‌সে উঠলো সুমন্ত্রর চোখ, একটা চাপা বিদ্যুত আহত সাপের মত লাফিয়ে উঠলো যেন—'কেন, কী করেছি আমি? কী করেছি? কেন এ-সব যা-তা বলছো আমাকে? যা তোমাদের মুখে আসে তা-ই যে আমাকে বলতে পারো তা তো এই কারণেই যে আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিই? বেশ, নেবো না আমি তোমার টাকা, আর নেবো না। নিজের ব্যবস্থা করতে পারবো নিজেই।'

এমন একটা ধাক্কা লাগলো হৃষীকেশবাবুর বুকের মধ্যে, টন্‌টন্‌ করে' উঠলো হৃৎপিণ্ডের শিরা-উপশিরা। মন্তু আজ এ-কথা বলছে, মন্তু, মন্তু! কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যথা গেলো কেটে, ঠেলে উঠলো রাগের স্রোত, রাগের প্রবল জোয়ারে তিনি রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে গেলেন। মারতে পারতেন তিনি, তাঁর এই অবাধ্য নির্বোধ উদ্ধত ছেলেকে হাত তুলে মারতে পারতেন যদি না হঠাৎ তাঁর রাগ ফেটে পড়তো প্রচণ্ড অট্টহাস্যে। সে-হাসি এমনি আকস্মিক ও অদ্ভুত যে চমক লেগে কেঁপে উঠলো সুমন্ত্রর ভিতরটা।

'এতক্ষণে তুমি প্রমাণ করলে যে তুমি সত্য-সত্যই মূঢ়। তোমাকে টাকা দিয়ে আমি তোমাকে যা-তা বলবার অধিকার উপার্জন করেছি!

তুমি আমার চাকর কিনা! 'আর্থিক একটা বাধ্য-বাধকতা আছে বলে'ই তুমি—'

হৃষীকেশবাবুকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে সুমন্ত্র বলে' উঠলো : 'টাকার হিসেব চাইতে তো ভোলো না তুমি।'

'একশোবার চাইবো!' হৃষীকেশবাবু এমন এক ঘুষি মারলেন টেবিলে যে কাচের কাগজ চাপাগুলো পর্য্যন্ত নেচে উঠলো। 'আমার টাকা, তার হিসেব একশোবার চাইবো আমি। তোমার মঙ্গলের জন্যও সেটাই দরকার। কার রক্ত-জল-করা টাকা অনায়াসে সিগারেটের ধোঁয়া করে' তুমি উড়িয়ে দাও, একবার ভাবো সে-কথা।'

ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে ধরে' সুমন্ত্র বললে : 'কারো রক্ত-জল-করা টাকাই নয়। আমার টাকা।'

'তোমার টাকা!' হৃষীকেশবাবু এমন সুরে কথাটা বললেন যে সুমন্ত্রর চোখ তুলে তাকিয়ে জবাব দিতে রীতিমত শক্তি ও সাহসের দরকার হ'লো।

'আমার টাকা। আমার স্কলার্শিপের টাকা।

'বদ্‌খেয়ালে ওড়াবার জন্যেই তোমাকে স্কলারশিপ দেয়, না?'

'যারা ওটা দেয়, তারা দিয়েই দেয়, হিসেব চায় না। আর-কিছু দেখে না তারা, খালি পরীক্ষার নম্বর দেখে।' উজ্জ্বল উত্তেজিত চোখ তুলে, সুমন্ত্র তার বাবার দিকে তাকালো। এখানে তার জয়, তার শ্রেষ্ঠতা। পরীক্ষায় তার উঁচু নম্বর, হাজার ছেলের মধ্যে অনায়াসেই সে পয়লা মার্কা। আর যা-ই হোক্, তার এ-গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

পারিবারিক

হৃষীকেশবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু চুপ করে' রইলেন। তারপর মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন :

'তুমি ইতিমধ্যেই "আমার" আর "তোমার" টাকা আলাদা করে' দেখতে শিখেছো। তা যদি না-শিখতে তাহ'লে হয়-তো তোমার মনে হ'তো যে এর কমেও চলে। হয়-তো আমার কাছ থেকে যতটা বেশি পারো আদায় করে' নিতে না। হয়-তো একবার ভাবতে, অত বড় সংসার কেমন করে' চলে। মনে করতে পারতে যে আমার আগের মত রোজগার আর নেই, নেই কোনো সঞ্চয়, এবং শিগগিরই তোমার একটি বোনের বিয়ে দিতে হবে।'

'এত কথা কেন বলছো ? আমি তো রাজিই আছি—আমাকে আর টাকা পাঠিয়ো না।'

'স্ত্রীলোকের মত অভিমান কোরো না, পুরুষ হ'তে শেখো। তোমার কি মনে হয় না সত্যি-সত্যি তুমি খুব বেশি খরচ করো ?'

'বেশি !' সরল বিশ্বাসের সুরে সুমন্ত্র বললে। 'কিছুই না। অভাব আমার লেগেই আছে।'

'ও-অভাব তোমার নিজের সৃষ্টি, তা কখনোই ঘুচবে না—যদি না তুমি অভ্যেস বদ্‌লাও। ক'টা ছেলে তোমার মত খরচ করে. শুনি ?'

'অনেক ছেলে আরো অনেক বেশি করে। বাজে খরচ শ' খানেক টাকা করে, এমন ছেলেও পড়ে আমাদের কলেজে।'

মুহূর্ত্তকাল চুপ করে' থেকে হৃষীকেশবাবু বললেন : 'মন্তু, তুমি তো ধনীসন্তান নও। আর যদি হ'তেও, তবু ও-রকম মস্তিষ্কহীন অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে পারতুম না আমি।'

'অপব্যয় কেন? ধরো আমি বই কিনতে চাই, ধরো আমি দেশ-বিদেশ বেড়াতে চাই; চাই প্রকৃতির লীলা দেখতে, চাই শ্রেষ্ঠ মানুষদের মনের পরিচয়। তার জন্যে যদি আমার টাকা লাগে?'

'মন্তু: তুমি নিজে বড় হবে, কোনো ইচ্ছাই হয়-তো তোমার অপূর্ণ থাকবে না। মন্তু: মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো, আমাদের দিকে একটু তাকাও।'

সুমন্ত্রর মাথা-ঝাঁকুনিতে এক গোছা চিকচিকে কালো চুল তার কপালের উপর লাফিয়ে পড়লো।—'আমি কী করলে তোমরা খুসি হবে তা বুঝি না। আমাকে কষ্ট করে' যদি থাকতে বলো, তা পারিনে ভেবো না। বাধ্য হ'লে সকলেই কষ্ট করে। কিন্তু বাধ্য না-হ'লে কষ্ট করে কে? আমি এমন-কিছু প্রচণ্ড বিলাসিতায় ডুবে থাকিনে যাতে এত সব কথা আমাকে শোনাতে পারো। আমি যে-রকম থাকি, যে-রকম চলি সে-রকম না-হ'লে আমার চলে না। সেটা অনেকদিনের অভ্যেসের ফল। সে-অভ্যেস করিয়েছো তোমরাই। ফর্সা জামা-কাপড় না-পরলে আমার চলে না, বন্ধুদের মাঝে-মাঝে না-খাওয়ালে আমার চলে না। চলে না বায়োস্কোপ না-দেখলে। চলে না এটা-ওটা অনেক-কিছু না-হ'লেই। চলে না যে, সেটা আমার দোষ নয়। আমার যে-রকম জন্ম, যে-রকম শরীর-মন, যে-রকম শিক্ষা, তাতে ওগুলো প্রয়োজন। কত ছেলে কত কষ্ট করে' পড়ে তা কি আমি চোখে দেখি না? কত লোক কত দীনভাবে থাকে তা কি জানিনে আমি? কিন্তু আমি কি পারি ও-রকম থাকতে? আর কেনই বা থাকবো—তেমন দুরদৃষ্ট নিয়ে যখন জন্মাই নি? দুঃখী হওয়াটাই তো মহৎ কথা নয়: যে যতটা পারে, সুখী হওয়ার চেষ্টাই তো করে সকলে।'

পারিবারিক

হৃষীকেশবাবু খানিকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে' রইলেন।

'শোনো : আমার বাপ যখন মারা যান, আমার আঠারো বছর বয়েস। কলেজে পড়ি। আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু নিরন্ন ছিলেন না; এবং তাঁর অন্নে আত্মীয়-কুটুম্ব জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ঠিক আমারই সমান অধিকার ছিলো। তারও বেশি—আমরাই ছিলাম অতিথি আশ্রিত উপযাচকের প্রসাদজীবী। যে যা খেতে চায় খাবে, আমরাই কখনো কিছু চাইতে পারবো না। সকলের শোবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে যেখানে-সেখানে আমাদের বিছানা। নিজের ছেলেমেয়ে বলে' কখনো বিশেষ কোনো যত্ন হ'তো না, নিজের ছেলেমেয়ে বলে'ই হ'তো না। অতিথির কোনোরকম অনাদর করা যায় না, নিজের ছেলে তো নিজের ছেলে।'

এখানে সুমন্ত্র বলে' উঠলো, 'শুনেছি এ-সব কথা।'

'আবার শোনো। তোমাদের একালের কথা শুনলাম, আমাদের সেকালের কথা কিছু শোনো। বাপ তো মরলেন, একটা পয়সা রেখে গেলেন না। রইলো বিধবা মা, বিবাহযোগ্যা বোন। একটা সংসার পড়লো আমার মাথায়। কলেজ ছেড়ে মাষ্টারি নিলুম গ্রামের ইস্কুলে। কুড়ি টাকা মাইনে। দেশের জমি-জমা বেচে বোনের বিয়ে দিলুম। মাষ্টারির ফাঁকে-ফাঁকে পরীক্ষা দেয়া, কত কষ্টে জমতো ফী-এর টাকা। এমনি করে' বি-এ পাশ করলুম, পাশ করলুম বি-এল্। তদ্দিনে ইস্কুলে তিরিশ টাকা মাইনে পাই। টিঁকে থাকলে হয়-তো একদিন হেডমাষ্টারই হ'য়ে যেতাম।' হৃষীকেশবাবু তিক্ত, শুষ্কভাবে হাসলেন। আরো বলবার তাঁর নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু, কথাটা যেন শেষ হ'য়ে গেছে এমনিভাবে সুমন্ত্র বলে' উঠলো :

পারিবারিক

'তোমার অদৃষ্টে তুমি কষ্ট পেয়েছো। সেটা কি আমার দোষ যে সেজন্যে আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?'

'সমস্ত জীবন দু' হাতে একা যুদ্ধ করেছি, একটু ভর দিয়ে দাঁড়াবার কখনো কেউ ছিলো না। এখন মনে এ-রকম একটা আশা হয় যে তোমরা আমার দুঃখ বুঝবে।'

'কিন্তু এখন তো তোমার কোনো দুঃখই নেই।'

'এখনো চলেছে যুদ্ধ। বয়েস হ'য়ে আসছে। এই মস্ত সংসার, মেয়ের বিয়ে আসছে সামনে—তার উপর তোমরা যদি এক-একটি মূর্তিমান উড়নচণ্ডী হ'য়ে ওঠো—নিজে আমি এ-বয়েস পর্য্যন্ত প্রতিটি পয়সা হিসেব করে' চলেছি, আর তুমি আমার ছেলে, এখনি তোমার গরমের দিনে পাহাড়ে না-গেলে চলে না, এখনই তোমার কুড়ি টাকার সিগারেট লাগে মাসে! এ-পর্য্যন্ত যত টাকা তোর পিছনে খরচ হয়েছে, ক'টা বড়লোকের ছেলের পিছনে তা হয় রে? আর তুই এত বড় স্বার্থপর গোঁয়ার যে নিজের তুচ্ছ কোনো সুখে একটু বাধা পড়লেই উল্টে আমারই উপর রাগ করিস!'

'চুপ করো, বাবা, চুপ করো, আর শুনতে চাইনে।' সুমন্ত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ আগুনের মত লাল, বিপর্য্যস্ত উদ্‌ভ্রান্ত চুল। 'কেন করেছিল খরচ, আমি বলেছিলুম করতে? আমি চেয়েছিলুম পৃথিবীতে আসতে? আমি একটা মস্ত খরচ, এ-কথাই তো এতক্ষণ ধরে' বোঝালে? কিন্তু এ-খরচটা কেন হ'লো? কে দায়ী আমার অস্তিত্বের জন্যে? এই মস্ত সংসার কার? প্রতিদিন একটু-একটু করে' আমার উপর এইরকম অত্যাচার করবার চাইতে একবারে বলে' দাও—আমি যাই চলে' যেদিকে আমার খুসি।'

পারিবারিক

একটা বোমা ফাটলো।

'যাও, যাও, এক্ষুনি যাও, বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনা থেকে। উচ্ছন্নে যাও, জাহান্নমে যাও, যাও যেখানে তোমার খুসি। তোর অস্তিত্বের জন্যে দায়ী কে, তা তোর মুখ থেকে আমাকে শুনতে হবে না। তুই আমার ঘোরতর অপকর্ম—তোর জন্মে আমার আনন্দ রাখবার জায়গা ছিলো না; আজ দেখছি সে-জন্ম না-হ'লেই ভালো হ'তো। একটা কথা তোকে বলে' দিচ্ছি এই: মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবিস্‌নে যে আমি তোর কোনোরকম প্রত্যাশী। ঈশ্বর করুন', বলতে-বলতে হৃষীকেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'ঈশ্বর করুন, কোনোদিন যেন কারো থেকে নিতে না হয়। আঠারো বছর থেকে এ-পর্য্যন্ত নিজের পায়ে নিজে চলে' এসেছি, কারো তোয়াক্কা রাখিনি। এ-শরীর যতদিন আছে কিচ্ছু ভয় করিনে। ঈশ্বর করুন, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এমনি যেন খেটে খেয়ে যাই—আর কিছু চাইনে আমি। তুই বুঝি ভেবেছিলি আমি তোর কাছে চাই—তাই জানিয়ে দিলি কে কার জন্যে দায়ী? ছী-ছী-ছি, আমিও এমন বোকা তোকে এ-সব কথা বলতে গেছলুম। যা, যা, এক্ষুনি যা তুই এখান থেকে—'

হৃষীকেশবাবু কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে বসে' পড়লেন।

এগারো

দিনের শেষ। গ্রীষ্মের দীর্ঘ গোধূলি সমস্ত সহরের উপর একটা রঙিন কুয়াশার মত। ঘরে আলো কমে' এসেছে, কিন্তু আকাশে চলেছে লাল আভার লীলা। দোতলায় অরুণার কোণের ঘরে পশ্চিমের দুটো জানলা খোলা ; আকাশের আভা লেগেছে সাদা দেয়ালে, লেগেছে একটি সরু সোনালি ফিতে অরুণার কালো চুলে। অরুণার মাথা আনত, হাঁটুর উপর কনুই আর গালের উপর হাত চেপে সে চুপ করে' বসে'। অরুণার মুখ ফেরানো, আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চুলের বাঁ দিকে তার সিঁথি, যেন কোন্ অপূর্ব্ব দুঃসাহসের রাস্তা দুরাশার দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। তেমনি লাগছিলো অশোকের চোখে, তেমনি কাঁপছিলো অশোকের বুকে, অরুণার পাশে বসে' সেই ঝিকিমিকি গোধূলি-বেলায়। কিছু হয়েছে, কিছু বলা হয়েছে দু' জনের মধ্যে, তারপর দু'জনেই চুপ।

তারপর অশোক বললে, নিঃশ্বাসের মত স্বরে : 'অত ভাবছো কী?'

অরুণা কিছু বললে না।

অশোক দু' আঙুল দিয়ে তার বাহু ঈষৎ স্পর্শ করে' বললে : 'কী ভাবছো, বলো না।'

অরুণা মুখ ফেরালো। তার চোখের নিচে একটা লুকানো ভয়ের ছায়া লাফিয়ে উঠলো যেন।

অশোক আবার বললে : 'এত ভাববার কী আছে ?'

অরুণা ম্লান একটু হেসে কপালের উপর একবার হাত বুলোলো। একটু কাটলো চুপচাপ।

'শোনো, শোনো অরুণা', থেমে-থেমে, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে-টেনে বললে অশোক, 'শোনো, আমার দিকে তাকাও।'

'কী, বলো ?' আধখানা মুখ ফিরিয়ে অরুণা বললে।

'তুমি নিজে দেখেছিলে চিঠিটা ?' কথাটা খুবই সহজ সুরে বলা হ'লো, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেলো তার পিছনে কঠিন নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা।

'বললাম তো', অরুণার গলা প্রায় বুজে এলো, এটুকু বলতে।

'চিঠি একটা লিখলেই তো আর কিছু হ'য়ে গেলো না', অশোক ক্ষীণ হাসলো। তারপর আরো স্পষ্ট করে' হেসে বললে : 'তুমি দেখি মূর্ত্তিমতী ট্র্যাজিডি হ'য়ে উঠলে এরই মধ্যে।'

পাৎলা একটু হাসি খেলা করে' গেলো অরুণার ঠোঁটে। অশোকের মুখের উপর তার কালো চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি ঝলসে বললে : 'বলো, আরো বলো।'

'আমি তো কতক্ষণ ধরে'ই বলবার চেষ্টা করছি', এবার সত্যি-সত্যি হালকা সুরে অশোক বললে। 'অন্যের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়া ন্যায়সঙ্গত নয়, তবে এবারের মত তোমার এই ত্রুটি ক্ষমা করা যাচ্ছে। জানা রইলো, প্রস্তুত থাকবো।'

মাথা ঝেঁকে বলে' উঠলো অরুণা : 'কী করে' পারো! কী করে' পারো এমন হালকা সুরে কথা কইতে!'

'এখন যদি হালকা হ'তে না পারি তাহ'লে মরে' যাবো যে। শোনো : আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্য-সামন্ত সব প্রস্তুত রইলো, কোন্‌টা ঠিক সময় তার একটা নোটিশ দিতে ভুলো না।'

হঠাৎ, অকারণে, অশোকের মনটা ফুর্তিতে উপ্‌চে পড়ছিলো যেন। ভয়াবহ সর্বনাশের মুখে এমনি হয় বুঝি। নেশার মত লাগে। কেননা ভয় পেতে আরম্ভ করলে ভয়ের শেষ নেই, কাঁদতে আরম্ভ করলে কান্না শেষ হবে গিয়ে আত্ম-বিলোপে। বিপদের মুখে যে উত্তেজনার উল্লাস, যৌবনের রক্তে আছে তার সুর। যৌবনই জানে হতাশার বুকে বুক চেপে কেঁদে মরতে : যৌবনই পারে উচ্চহাসির উদ্দাম পাখায় হতাশার পাতাল পার হ'য়ে যেতে।

'নাটক হয়েছে সাজানো, এবার পরদা উঠলেই হয়', উপমা বদ্‌লে অশোক আবার বললে। 'তোমার পার্ট ঠিক মনে আছে তো, অরুণা?'

'কী বলছো তুমি? কী ভাবছো তুমি?' অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায় অরুণা বলে' উঠলো।

'তুমি যা ভাবছো, আমিও তা-ই ভাবছি। তুমি বলতে পারছো না, আমি বলছি।'

'সত্যি-সত্যি—?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তুমি বোঝো না, তুমি জানো না?'

আর হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো অশোক, অরুণার চোখে।

সেই ছায়া-ভরা আলোয় এমন সুন্দর সে দেখলে অশোককে যেমন আর কখনো দেখেনি। মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

'ভয় করে তোমার?' কানে-কানে বলার মত মৃদুস্বরে অশোক বললে।

'যদি বলি করে, তবে কি খুব রাগ করবে?'

'ভয় কোরো না, কোনো ভয় নেই।' অশোক আস্তে অরুণার করতল একটু স্পর্শ করলে, থর্‌থর্‌ করে' কেঁপে উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা।

'অবাক লাগে আমার', অরুণা যেন একটা মূর্চ্ছার ভিতর থেকে বলতে লাগলো। 'কোথায় পাও তুমি এই সাহস, কোথায় পাও এই শক্তি?'

'কোথায় পাই!' অশোক তার ঘনচুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালিয়ে দিলে। 'পাই ঐখানে, তোমার ঐ নরম ছোট-ছোট আঙুলের আগুনের শিখায়। তুমি যাকে বলছো সাহস আর শক্তি, এ কি আমার! পাগল, এত জোর কি আছে আমার মধ্যে!'

'তবে?' রুদ্ধশ্বাসে বলে' উঠলো অরুণা।

'সেই তো আশ্চর্য্য। কী জাদু আছে তোমার হাতে, তোমার চোখে তোমার কথায়—তা কি তুমি নিজেই জানো! তোমার ঐ হাত যেন যুদ্ধের নিশান—তার ডাকে আমি যা পারি, তা কি পারি আর-কিছুর জন্য!'

অরুণা কিছু বললে না, এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন পলক পড়ে না। আর অশোক বলতে লাগলো:

'পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়েছো

তোমরাই—তোমরা মেয়েরা। দুঃসাহসের রাস্তা খুলে দিয়েছো তোমরাই তো। পুরুষ তোমাদেরই হাতের সৃষ্টি—তোমাদেরই বাঁকা চোখের স্বপ্নের আকাশে পুরুষ নির্মাণ করেছে তার কীর্ত্তির রূপকথা। তোমরাই ঘর-ছাড়া করেছো পুরুষকে—এগিয়ে দিয়েছো কালো চুলের ধাক্কায় সর্বনাশের পথে।'

ধ্বক্ করে' উঠলো অরুণার বুকের মধ্যে। কাঁপা গলায় বললে, 'না, না, অমন কথা বোলো না।'

অশোক ক্ষীণ হেসে কপালের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলে।—'পাগল! আমাকে দিয়ে কোনো ভয় নেই তোমার। সে আলাদা জাতের মানুষ—যারা সর্বস্ব পণ করে অনায়াসে, মরতে-মরতেও যাদের জেদ মরে না। অরুণা, তাদের হার হয়, তারা মরে—কিন্তু তাদের হাজার হারের উপরেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসে এ-ই তো দেখে এলাম। তোমার ভয় নেই—তোমার এই অশোক সেন সে-জাতের মানুষ নয়। সে বীর নয়, সে যোদ্ধা নয়, সে কবি নয়, অতি সাধারণ মানুষ সে।—তবু ঈশ্বর তাকে আজ অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন তার পৌরুষ প্রমাণ করতে। সে-সুযোগ সে হারাবে না।' শেষের কথাটা অশোক বললে ভীরু ছোট গলায়, চুপে-চুপে।

ছায়া আরো ঘনিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, ভালো করে' মুখ দেখা যায় না। অরুণা নতমুখে বসে' রইলো স্তব্ধ হ'য়ে, তার বুকের রক্তে হাজার সমুদ্রের তোলপাড়।

একটু পরে অশোক বললে, খুবই সহজভাবে: 'তা তোমার একান্ত অমতে তোমার মা-বাবাই কি কিছু হ'তে দেবেন?'

'চিঠি থেকে তো মনে হ'লো', বলতে গিয়ে কেঁপে গেলো অরুণার গলা, 'মনে হ'লো—যেন সবই প্রায় ঠিক।'

'তোমাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন তো ?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করবার আবার দরকার কী ? আমি ছেলেমানুষ— আমি কি নিজের ভালো-মন্দ কিছু বুঝি ?'

'তাই বলে' জোর করে' তো আর বিয়ে দিতে পারেন না !'

'পারেন না, না ? পারেন না ?' অরুণা প্রশ্ন-ভরা ব্যাকুল চোখ তুলে অশোকের দিকে তাকালো। 'কী হবে, কী উপায় হবে আমার ?' বলতে-বলতে অরুণার দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়লো। চোখের জল লুকোতে চাইলো না সে, তাকিয়ে রইলো অসহায় সমর্পণের ছবির মত।

'কাঁদছো কেন ?' বললে অশোক, 'কেঁদে কী হবে ?'

'কেন এমন হ'লো ? কেন আমার দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে ? কেন আমি নিজে ডেকে আনলাম নিজের সর্বনাশ ? এখন আমার কী উপায় হবে, এখন কী উপায় হবে আমার ?' অরুণা দু'হাত মোচড়াতে লাগলো, যেন শরীরের যন্ত্রণায়, আর তপ্ত দ্রুত অশ্রুস্রোত নেমে এলো তার গালের উপর দিয়ে।

আর অশোকের মনে হ'লো যেন নিশান লাফিয়ে উঠেছে আকাশে, বাতাসে ভেসে এসেছে ডাক, আর দেরি নেই। আর অরুণার অশ্রুস্রোত মুহূর্ত্তে একটা রূপালি তলোয়ার হ'য়ে উঠে তাকে মারলো।

'কেঁদো না', একটা অসহ্য ব্যথার ভিতর থেকে সে বলে' উঠলো, 'চলো তোমাকে কালই বিয়ে করি।'

পারিবারিক

দু'হাতে মুখ ঢেকে তীব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝেঁকে উঠলো অরুণা : 'না, না, তুমি যাও, এখনই যাও তুমি—এখানেই শেষ হোক্।'

'শেষের কথা কী বলছো, এই তো আরম্ভ হ'লো। পারবে না তুমি স্পষ্ট করে' তোমার মা-বাবাকে বলতে—পারবে না ?'

অরুণার সমস্ত শরীর থরথর করে' একবার কেঁপে উঠলো, যেন জ্বরের ঘোরে। বলে' উঠলো কান্নায় ভাঙা-ভাঙা গলায় : 'তুমি যে আলাদা জাত !'

'তা তো জানি। তবু এতে তো সন্দেহ নেই যে আমাদের মিলতেই হবে। তোমার বয়েস আঠারো হয়েছে তো ?'

'কেন, এ-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ?'

'যা ভয় করছো তা-ই যদি হয়, যদি আর উপায় না-ই থাকে··· তাহ'লে শেষ উপায় যা আছে তা-ই করতে হবে।'

'কী সেটা ?'

'পালিয়ে যেতে হবে,' আশ্চর্য্য লঘুতার ঢঙে বললে অশোক।

'পালিয়ে !' সঙ্গে-সঙ্গে বংশানুক্রমিক অনতিক্রম্য সংস্কারের ধাক্কায় নীল হ'য়ে গেলো অরুণার মুখ।

'শেষ উপায় সেটাই তো। তারপর রেজেষ্ট্রি করে' বিয়ে হবে।'

'তারপর ?'

'তারপর···And they lived happily ever afterwards. রূপকথার শেষের পাতা।'

'আর আমাকে কি ছাড়তে হবে এই বাড়ি—বাবা মা ভাই বোন—ঐই সমস্ত কিছু, জন্ম থেকে যার সঙ্গে আমি জড়িত—ছাড়তে হবে এই সব ?'

পারিবারিক

'ছাড়তে হবে, সব ছাড়তে হবে—যদি দরকার হয়।'

'আর তুমি—তোমার কী দশা হবে! এর সঙ্গে-সঙ্গে আসবে দুঃখ, আসবে অভাব···সে যে কত ভয়ানক তা কি তুমি বুঝতে পারছো!'

অশোক ম্লান হাসলো।

'আমি ও-সমস্ত ভেবে রেখেছি অনেক আগেই।'

'সব কি ভেবেছো? মানুষের মুখ হাঙরের মত হাঁ করে' তোমাকে খেতে আসবে তা কি ভেবেছো? হয়-তো খাওয়া জুটবে না, হয়-তো আদালত-পর্য্যন্ত গড়াবে—তা ভেবেছো?'

'সব আমি ভেবেছি, সব। আমার নিজের মন আমি নিঃসংশয়েই জানি, তুমি তোমার মন জানো কিনা সেটাই এখন কথা।'

'আমি! আমি···কী? এই তো আমি তোমার জীবন ছারখার করে' দিতে চলেছি—এমন সুন্দর জীবন তোমার! এত বড় দুর্ভাগা আমি, তোমার স্বচ্ছন্দ শান্তির জীবনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর, দুঃখ যখন অসহ্য হবে, আমাকেই কি তুমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করবে না! তখন আমি কী করবো? তখন আমি মরবো কেমন করে?'

'হায়রে, কেবল আমার দুঃখের কথাই বলছো কেন? যতই ভয়াবহ হোক, সে-দুঃখ তো তোমারও! তুমি কি দুঃখ পেয়ে আমাকে ঘৃণা করবে? পৃথিবীতে এমন কি কোনো দুঃখ আছে, যা তুমি-আমি একসঙ্গে সইতে না পারবো? আর-কিছু ভেবো না, আর-কিছু বোলো না: এই শুধু মনে-মনে বোলো যেন তোমাকে-আমাকে পরস্পরের থেকে কেউ কাড়তে না পারে। সেটা দুঃখের কারণ হবে না, সেটা হবে ধ্বংস।'

'হয় তোমাকে দুঃখ দেবো, নয় তোমাকে ধ্বংস করবো—এই আমার কপালে ছিলো!' অরুণার কথার স্বরে বেজে উঠলো চরম হতাশা।

'আমার জন্তেই তোমার এত করুণা,' একটু উচ্চস্বরে অশোক বলে' উঠলো, 'যেন এতে তোমার নিজের কিছু নেই। দুঃখ পেতে হ'লে তুমিও পাবে যে, ধ্বংস হ'তে হ'লে তুমিও হবে! আমি তো তোমার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলি না একবারও। দুঃখ তুমি যেন না পাও, এমন মূঢ় প্রার্থনাও করিনে কখনো। অরুণা, এই পৃথিবীতে দুঃখের হাত থেকে আমরা কে কাকে বাঁচাতে পারি। আমি তোমাকে বলছি, অরুণা, আমার সঙ্গে এসে দুঃখ পাবে তুমি, হাজার দুঃখ পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাবে জীবনের পরিপূর্ণতা।'

'কী বলছো তুমি! আমার সুখদুঃখের কথা আমি কি কখনো ভাবি? তুমি কি মনে করো আমি সুখের কাঙাল! কিন্তু,' হঠাৎ অদ্ভুত নিবিড় স্বরে অরুণা বলে' উঠলো, 'বাবা কী মনে করবেন, বাবা কী মনে করবেন আমাকে! কত কাঁদবেন মা···কী ভীষণ লাগবে তাঁদের মনে!'

'এই তো!' অশোক এতক্ষণ বসে' ছিলো, হঠাৎ সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। 'এই তো এবার বেরিয়ে এলো আসল মানুষ, আসল অরুণা রায়। দেখা গেলো, তার মনে সংস্কারের সাপ এতক্ষণ বিঁড়ে পাকিয়ে লুকিয়ে ছিলো, এইবার সময় বুঝে গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে ফুঁসে উঠছে।'

'পায়ে পড়ি তোমার, অমন নিষ্ঠুরের মত বোলো না। তুমিই বলো, বাপ-মাকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে যাওয়া কি এতই সোজা!'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না, বাপ-মা সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনে। তবে এটা তুমি ভুলে' যাচ্ছো কেন যে এ-দুর্ঘটনা নিবারণ করা তো তোমার

বাপ-মায়েরই হাতে। আমরাও তো তা-ই চাই, আমরাও তো চাই যে সহজেই হ'য়ে যাক্। যদি তা তাঁরা না-ই হ'তে দেন, তাহ'লে বাধ্য হ'য়েই আমাদের বাঁকা রাস্তা নিতে হবে। সে-জন্যে দায়ী হবেন তাঁরাই। তুমি যে পায়ের নিচে মাড়িয়ে যাওয়ার কথা বললে, সে তো তাঁরাই ডেকে আনবেন নিজেদের উপর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে অরুণা : 'কেন হয় এ-রকম, কেন হয়? কেন হয় ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব?'

অশোক রাস্তার উপর জানলার দিকে দু'পা হেঁটে গেলো, তারপর ফিরে এসে দাঁড়ালো অরুণার মুখোমুখি :

'সুন্দর বলেছো কথাটা। এখন আমি তোমাকে খুব সহজ একটা প্রশ্ন করবো, ভালো করে' ভেবে উত্তর দিয়ো। তুমি কি আমাকেই চাও, না তোমার বাপ-মাকে?'

অরুণা বড়-বড় চোখে তাকিয়ে রইলো, মূঢ়ের মত।

অশোকের ম্লান-নিবিড় মুখের একটি পেশীও কুঞ্চিত হ'লো না। স্পষ্ট উচ্চারণ করে' বললে : 'বলো, এখন সময় হয়েছে মন স্থির করবার। তুমি কি আমাকেই চাও, না তোমার বাপ-মাকে?'

'তোমাকেই—তোমাকেই চাই', সম্মোহিতের মত বলে' উঠলো অরুণা।

সঙ্গে-সঙ্গে শিথিল হ'লো অশোকের মুখের ভাব। মুখ নিচু করে' বললে : 'তাহ'লে তোমার মাকে বলি গিয়ে। না কি, তুমিই আগে বলবে?'

'আমিই বলবো', অরুণা প্রশান্তভাবে বললে। আর তার দিকে

তাকিয়ে অশোক হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে কখন্ অজান্তে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে সে—দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত বালিকা হ'য়ে উঠেছে সম্পূর্ণ, আত্ম-নির্ভর স্ত্রীলোক। আশ্চর্য্য লাগলো তার মনে-মনে; মনে হ'লো এই যেন সে অরুণাকে প্রথম জানলো।

অশোক বসলো তার পাশে, হাতখানা তুলে নিলে নিজের হাতের মধ্যে।—'তুমিই বলবে?'

অরুণা হাত ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টা না-করে' বললে: 'আমিই বলবো।'

'হয়-তো সহজেই হ'য়ে যাবে', বললে অশোক।

'হয়-তো', প্রতিধ্বনি করলে অরুণা।

'তাঁরা তো তোমার বিয়ে দিতেই ব্যস্ত; আর এ-রকম বিয়ে তো কতই হচ্ছে আজকাল!'

'তা তো হচ্ছেই।'

'আর যদি এমন হয় যে তাঁরা···বিমুখ হ'লেন, তাহ'লে···খুব কি কষ্ট হবে তোমার এই সমস্ত···ছাড়তে···ছেড়ে যেতে?'

'কষ্ট হবে না!' অরুণা তার সরল উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরলো অশোকের দিকে। আর সে-চোখের দিকে তাকিয়ে অশোকের হৃৎপিণ্ড ব্যথায় মুচড়িয়ে উঠলো, সব কথা গেলো হারিয়ে।

'তুমি কিছু ভেবো না', অরুণা আস্তে অশোকের হাতে একটু চাপ দিলে। 'আমি মেয়ে, তোমাকে আমি কথা দিয়েছি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

তারপর দু'জনেই বসে' রইলো চুপচাপ, হাতে হাত রেখে। ঘরের

মধ্যে অন্ধকার, ঘরের মধ্যে নিঃশব্দ হাওয়ার ঢেউয়ের ওঠা-পড়া। এমন সময় হঠাৎ পাৎলা স্যাণ্ডেল পায়ে সুমন্ত্র সে-ঘরে ঢুকলো, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো দরজার কাছে।

এক মুহূর্তের নিবিড় স্তব্ধতা, তারপর অশোক উঠে গিয়ে সুইচ টিপলো। হঠাৎ তীব্র আলোর ধাক্কায় অরুণা চোখ ঢাকলো দু' হাতে।

সুমন্ত্র ঈষৎ হেসে বললে : 'দুঃখিত। তোর কাছে টুর্গেনিভের একটা গল্পের বই দেখেছিলাম, অরুণা, তা-ই নিতে এসেছিলাম।'

অশোক বললে : 'বই এখন থাক্। চলো, সুমন্ত্র, তোমার ঘরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বারো

সেদিন রবিবার। সকালবেলা চায়ের প্রস্থ শেষ হ'য়ে যাবার পরে অরুণা তার দোতলার ঘরে গিয়ে একটা সেলাই নিয়ে বসেছিলো। সেলাইটা উপলক্ষ্যমাত্র; একেবারে খালি হাতে চুপচাপ বসে' থাকলে ভালো দেখায় না। আসল উদ্দেশ্যটা একা থাকা, নির্জনে থাকা, চুপ করে' বসে' থাকা। অশোকের সঙ্গে তার ও-সব কথাবার্ত্তা হয়েছে আজ পাঁচদিন। এর মধ্যে অশোক বার দুই এসেছে, কিন্তু অরুণার সঙ্গে একা দেখা হয়নি। অরুণাই গেছে এড়িয়ে। আর-কিছু নেই। আর-কিছু বলবার নেই। এ-ক'দিনে অরুণা যেন নিজের গভীরতম সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে; বাইরে থেকে নিজের সমস্তটা গুটিয়ে এনে বাসা নিয়েছে নিজের মধ্যে। এ-ক'দিন সে কাটিয়েছে খুব বেশি একা, কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলেনি, পালিয়ে এসেছে অলক্ষিতে পারিবারিক সঙ্গ থেকে। নানা কাজ ও ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত, হৃষীকেশবাবু কি বিজয়া কিছু লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য করেছে সুমন্ত্র, আর অরুণা টের পেয়েছে যে সুমন্ত্র লক্ষ্য করেছে। দাদার সঙ্গে দেখা হ'লে সে চোখ নামিয়ে নেয়নি, চোখ তুলে সোজা তাকিয়েছে, তারপর প্রশান্তভাবে চলে' গেছে সরে' অন্যদিকে।

পারিবারিক

সে শুধু চেয়েছে একা থাকতে, চেয়েছে একা বসে' চুপ করে' ভাবতে। এ-ক'দিন সে কেবল ভেবেছে দিনে-রাত্রে, আর-কিছু করেনি। কী ভেবেছে? সে জানে না। চলতে-চলতে যেন তার পথের সামনে জ্বলে' উঠেছে পুঞ্জ-পুঞ্জ আগুন, নেমে এসেছে আকাশ-জোড়া মেঘ, যেন লাল আগুনের মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরেছে চারদিক থেকে, সমস্ত পৃথিবী আড়াল করে' দিয়ে। চাপা পড়ে' গেছে সে, এই বৃহৎ বাস্তবের জগত থেকে সে আজ লুকালো। তার মনের সুরঙ্গ-অন্ধকারে দিন-রাত চলেছে চাপা গুমরানি, যেন অনেক দূরের আকাশ থেকে-থেকে মেঘের আওয়াজে কথা কয়ে' উঠছে। খেতে বসে' সে খায় কি না খায়, রাত্রে ঘুমোতে পারে না, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কাঁদে। ক'দিনে দস্তুরমত খারাপ হ'য়ে গেলো তার চেহারা। এবং এটা নিশ্চয়ই বিজয়ার চোখে পড়তো, যদি না তারই বিয়ের কথাবার্তার উপলক্ষ্যে তাঁর মনটা অস্বাভাবিকরকম ব্যাপৃত থাকতো।

সেদিন সকালে সে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলো, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ থোবা-থোবা ফুলের লাল মেঘে আকাশকে লেপে দিয়েছে। আর হঠাৎ তার সমস্ত মনটা ব্যথিয়ে উঠলো—অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা। এ যেন আর সে সইতে পারছে না, এই অবরোধ, গোপন সুরঙ্গের এই গুমরানি—ভাঙুক দরজা, ঝড় উঠুক—নামুক আকাশ-বাতাসের উদ্দাম নৃত্য তার বুকের মধ্যে। সেই বিশাল ভয়াবহ মুক্তির মধ্যে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

মনটাকে শান্ত করবার চেষ্টায় সে চোখ নিচু করে' সেলাইয়ে ফোঁড় তুলতে যাবে, এমন সময় হুড়দাড় করে' পিণ্টু ঢুকলো সে-ঘরে। হাতে

তার লুডোখেলার সরঞ্জাম। অরুণার কাঁধের উপর অকারণেই একটা চড় মেরে বললে :

'দিদি, এসো লুডো খেলি।'

তারপর, দিদির সম্মতির অপেক্ষা না-করে'ই লুডোর ছক পেতে বসে' গেলো মেঝেতে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে। কাঠের চোঙার মধ্যে ঘুঁটিটা সশব্দে নাড়তে-নাড়তে বললে : 'এসো, এসো শিগগির।'

ছেলেটার জ্বলজ্বলে মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বড় মায়া হ'লো। আস্তে বললে : 'পিণ্টু, এত কী তুই লুডো খেলতে ভালোবাসিস্!'

'ওঃ, এসো, এসো, ত্যাখো কেমন তোমাকে হারিয়ে দিই দশ মিনিটে। আমার কিন্তু লাল।'

'আমার সঙ্গে খেলে তো তোর ভাল লাগবে না—আমি তো আগে থেকেই হেরে আছি।'

নিজের উরুর উপর চড় মেরে চীৎকার করে' উঠলো পিণ্ট : 'খেলবে কিনা তা-ই বলো!'

অরুণা উঠে গিয়ে টান দিলে তার টেবিলের ছোট দেরাজে। চুলের কাঁটা-ফিতে, বন্ধুকে লেখা অসমাপ্ত চিঠি, একগাদা চকোলেটের মোড়ক ইত্যাদির মাঝখানে কপালগুণে একটি দু'আনি পাওয়া গেলো। সেটি হাতের তেলোয় রেখে পিণ্টুর সামনে হাত মেলে ধরে' বললে : 'এই নে।'

পিণ্টু তাকালো সেই লোভনীয় মুদ্রার দিকে, তারপর তাকালো দিদির মুখে, এই আশাতীত বদান্যতার পিছনে কোনো গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা, বোধ হয় তা-ই আঁচ করতে।

অরুণা বললে : 'নে এটা, তারপর ভাগ্, এক্কেবারে এক ছুটে পন্টুদের বাড়িতে। পন্টুকে হারাতে পারিস তবে বুঝি।'

'ইস্, পন্টুকে কতদিন হারিয়েছি না, জিজ্ঞেস করে' দেখো। তা ওর সঙ্গে আমি তো আর খেলবো না।'

'ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?'

'করেছি, বেশ করেছি। ও একটা ইষ্টুপিট্ ফুল্—দেখতে পারিনে দু'চক্ষে।'

'এই তো সেদিন কত ভাব দেখলুম।'

'তুমি খেলবে না আমার সঙ্গে? গজরাতে-গজরাতে পিণ্টু বললে। 'খেলবে না তো?'

'পিণ্টু, শোন্—'

অরুণা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাচ্ছিলো, পিণ্টু একলাফে গেলো সরে'।—'যাও, যাও—ভেবেছো কী তুমি, আমি একাই বেশ খেলতে পারবো—যাওঃ!' বলতে-বলতে, ফুঁসতে-ফুঁসতে ছিটকে বেরিয়ে গেলো বারান্দায়। পরমুহূর্ত্তেই ফিরে এসে বললে, 'কই পয়সা দেবো বলে' তারপর বুঝি আর দিতে হয় না!'

অরুণা একটু হেসে বললে : 'নিলেই তো হয়।'

ছোঁ মেরে দুয়ানি তুলে নিয়ে পিণ্টু বারান্দায় গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে' পড়লো মেঝেতে; লুডোর ঘর পেতে খেলতে বসে' গেলো মনে-মনে শত্রুপক্ষ সাজিয়ে।'

টুনকি এসে খবর দিলে : 'দিদি, মা তোমাকে নিচে ডাকছেন।'

পারিবারিক

নিচে যেতে একটুও ইচ্ছা করছিলো না অরুণার, জিজ্ঞেস করলে 'কেন রে ?'

টুনকি ঘাড়ের কাছে থোবা-থোবা চুল দুলিয়ে বললে : 'তা তো জানিনে।'

'কেউ এসেছে নিচে ?'

'কাপড়ের ফিরিওয়ালা এসেছে।'

ও, তা-ই। কোনো সাড়ি কি ব্লাউজপীস পছন্দ করতেই মা তাকে ডাকছেন বুঝি। আজকাল তার কাপড়চোপড়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে মা বড় বেশি সচেতন। প্রয়োজন—কিন্তু পঞ্চাশটা জামা আর চৌত্রিশটা সাড়িতে কি মানুষের প্রয়োজন ? তবু মা ফিরিওয়ালা দেখলেই আর ছাড়েন না— অরুণাকে ডেকে এটা নিবি ওটা নিবি, অরুণা চুপ করে'ই থাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু রাখাই হয়। একবার বছরখানেক আগে অরুণা যখন দু'টাকা দামের একখানা নীল রঙের ময়নামতীর সাড়ি কিনতে চেয়েছিলো, এই মা-ই বলেছিলেন :

'চাইতে শিখলে কবে ? তোমাদের যা দরকার তা তো না-চাইতেই পাও।'

সেদিন অরুণা যে-লজ্জা পেয়েছিলো তার তুলনা হয় না। ঘোরতর লজ্জা এই কারণে যে সত্যি সে মুখ ফুটে কখনো কিছু চায় না, হঠাৎ একটা খুসির ঝোঁকে সেই একবার চেয়েছিলো। এবং মা-র কথায় তার যে আত্মশুদ্ধি হয়েছিলো তার জন্যে সে কৃতজ্ঞই বোধ করেছে মনে-মনে : কিছু চাইতে হয় না—এ-কথা জীবনেও বুঝি সে ভুলবে না।

আর সেই মা আজ তাকে নানারঙের নানারকমের জামাকাপড়

কেনবার জন্য প্রতিদিন পিড়াপিড়ি করেন। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে অবিশ্যি। এ তার বিয়েরই আয়োজন। নয় তো তাদের অবস্থা হঠাৎ এমন-কিছু ফেঁপে ওঠেনি যে যত খুসি এবং যেমন খুসি জামা-কাপড় তার মঞ্জুর হ'তে পারে। বরং, সে যতদূর জানে, বাবার অবস্থা এখন নামতিরই দিকে। তার বিয়ে সম্বন্ধে এত ব্যাকুলতা তো সেইজন্যেই।

কাপড়ওয়ালা এসেছে—তাকে নিচে যেতে হবে। হঠাৎ একটা অসহ্য বিতৃষ্ণায় সমস্ত শরীর তার সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো। তার অনুভূতি যেন শারীরিক ন্যক্কারের মত।

'কই, যাচ্ছো না যে?' টুনকি আবার বললে।

অরুণা কিছু বললে না; কথাটা বোধ হয় তার কানেও ঢোকেনি।

টুনকি হঠাৎ অরুণার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপি-চুপি বললে: 'দিদি, তোমার বিয়ে হবে?'

এ-কথাটা অরুণা শুনে টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো তার সমস্ত মুখ। রাগের দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ডাকলে: 'টুনকি!'

ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে টুনকি দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে'।

'সারাদিন ঘুরে-ঘুরে বড়দের কথা গিলিস—আর নিজের মাথাটি খাচ্ছিস, না?'

টুনকি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গিয়ে বললে: 'আমি কী বলেছি, আমি তো শুধু—' ছোট মেয়েটার গলা তো প্রায় আটকে এলো।

'এ-সব কথা কক্ষনো আর বলবিনে।'

'না, আর কক্ষনো বলবো না।'

টুনকি মাথা ঝাঁকালো, দুলে উঠলো তার ঝাঁকড়া কালো এলোমেলো

চুল। অরুণা দেখলে, মেয়েটা বুঝি কেঁদেই ফেলে। তাড়াতাড়ি ওর কালো কুচকুচে মাথাটা টেনে নিলে বুকের কাছে। ঝরঝর করে' কেঁদে দিলে টুনকি।

ওর চুলে হাত বুলুতে-বুলতে অরুণা বললে : 'কেন বললি? জানিসনে, বড়দের কথা ছোটদের বলতে নেই।'

দু'হাতে চোখ চেপে ধরে' টুনকি আরো একটু কাঁদলো, তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে ঝকঝকে চোখে তাকালো দিদির মুখের দিকে। কান্না থেমেছে, লেগে রয়েছে চোখের কোনে কালো-কালো দাগ।

আর ঐ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন করে' উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা। এ-বাড়ির মধ্যে এই ছোট মেয়েটাই কেমন যেন আলাদা, যেন অন্যরকম। বেশির ভাগ সে থাকে একা, নিজের মনে; অন্যদের কাছে যখন ঘেঁষে, এমন একটি কুণ্ঠা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে', শিশুর মধ্যে যেটা স্বাভাবিক নয় একেবারেই। সে যেন আর সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কেউ কিছু বলবে এই আশায়। কিন্তু বিশেষ-কিছু কেউ বলে না, তাকে আমলেই আনে না কেউ, সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। শুধু বাবা মাঝে-মাঝে কাছে ডাকেন, তখন তার জীবন যেন ধন্য হ'য়ে যায়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তার শিশু-মনের সমস্ত পূজা সে দিয়েছে তার বাবাকেই; তার বাবা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তার বাবা তার অস্পষ্ট কল্পনার ঈশ্বরের মত। তাদের পরিবারে শিশুদের সামনে নানা বিষয়ে আলোচনায় বাধা নেই—টুনকি হয়-তো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব শোনে। কিছু কি বোঝে? কিছু কি বোঝে না? শিশুদের যতটা ছেলেমানুষ আমরা মনে করি, ততটা ছেলেমানুষ তারা

হয়-তো নয়। আর্থিক টানাটানির সঙ্গে-সঙ্গে পরিবারে নানারকম দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেয়; এই মেয়েটার মনে হয়-তো আছে সে সমস্তেরই অনুভূতি। গোপন মনে-মনে সবই হয়-তো সে বুঝবে—বাবার অভাব, দাদার অমিতব্যয়িতা, দিদির বিয়ের সমস্যা। তাই তো—তার মুখের ভাবটাই একটু অন্যরকম। সে যে সব বুঝছে সেটা তো তাকে গোপন করতে হচ্ছে সব সময়—সেইজন্যেই কি তার অমন কুণ্ঠা? মেয়েরা কি কিছু এইরকমই হয়? পিন্টু তো ওর তিন বছরের বড়, কিন্তু ও তো মেতে আছে ওর লুডো-ক্যারম-সিনেমার শিশু-স্বর্গে, ওর দাবরাবে আবদারে অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ। যত অসংখ্য বিচিত্র প্রয়োজন তার জীবনের, কোনো রহস্যময় ভাণ্ডার থেকে তার অফুরন্ত জোগান আসবেই, এই অন্ধ বিশ্বাসে সে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক। ক্ষেপে ওঠে সে, সেই বিশ্বাসে এতটুকু ঘা লাগলে। বাড়ির সঙ্গে তার শুধু সেই রসদ-জোগানোর সম্পর্ক, তার জীবনটা তো বাইরের বহুল বিচিত্রতায় ছড়ানো-ছিটোনো। ও-রকম কি হ'তে পারে মেয়েরা? মেয়েরা বুঝি কিছু আলাদাই হয়—নিজেকে দিয়েই সে তা বুঝতে পারে। শিশুকাল থেকে মেয়েরা থাকে ঘরে, ঘরের মধ্যেই তাদের সব খেলা আর খেয়াল; সব তারা শোনে, সব তারা ছাখে, কিছু-কিছু হয়-তো বোঝে। এই নির্জন মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে টুনকি নিশ্চয়ই চেয়েছিলো কোনো মনের কথা বলতে—নয় তো কোনো অসঙ্গত কি উদ্ধত মন্তব্য করবার মেয়ে তো সে নয়।

'কোথায় শুনলি রে, আমার যে বিয়ে হবে?' অরুণা বললে, মেয়েটার চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে।

টুনকি আর-কিছু বললে না; মাথা নিচু করে' আঙুলের নখ খুঁটতে

লাগলো। যথেষ্ট লজ্জা সে এমনিতেই পেয়েছে, আর অপমান করে’ কাজ নেই, এমনি তার মুখের ভাব।

‘বল্ না কোথায় শুনলি।’ অরুণা হাসলো, টুনকি যাতে সাহস পায়।

‘সবাই—বলছে,’ ক্ষীণ, অস্পষ্ট গলায় বললে টুনকি।

‘সবাই বলছে—না?’

অরুণা আর-কিছু বললে না—নাকি, আর-কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো? কী বলবে সে এই শিশু-মেয়েকে—আর এই মেয়েই বা কী বলবে তার কথা এর পরে…আরো পরে?

হঠাৎ, যেন ভিতরকার কোনো অপ্রতিরোধ্য চাপে, টুনকি বললে’ উঠলো; ‘তারপর তো তুমি আমাদের ছেড়ে চলে’ যাবে, দিদি?’

আর অরুণা নিজেও টের পেলো না কখন্ তার দু’চোখ জলে ভরে’ উঠলো। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট, একটানা ব্যথা, হৃৎপিণ্ডটা থেকে-থেকে মুচড়িয়ে উঠছে যেন। টুনকির দিকে না-তাকিয়ে সে উঠে গেলো, দাঁড়ালো জানলার ধারে গিয়ে, যেখানে বিলম্বিত কৃষ্ণচূড়া আকাশকে লাল করে’ দিয়েছে। নামলো কান্না।

তেরো

'অরুণা, কই গেলি তুই', বলতে-বলতে বিজয়া সে-ঘরে ঢুকলেন। হাতে তার দু'খানা জরজেটের সাড়ি, ভাবটা কিছু ব্যস্ত। 'অরুণা, আয় এদিকে, শোন্।'

মা-র ডাক শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে অরুণার কান্না নিজে থেকেই থেমে গেলো, যেন ভিতরকার কোনো যন্ত্রের কৌশলে: বাইরের দিকে তাকিয়ে অলক্ষিতে সে একবার চোখ মুছলো, তারপর মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে এলো।

'সেই ফিরিওয়ালাটা এসেছে—কী সুন্দর জরজেট এনেছে, ছাখ্।'

অরুণা চুপ করে' রইলো।

'সেই কখন থেকে ডাকছি তোকে। ছাখ্, এ দুটো আমি পছন্দ করে' আনলাম, এর মধ্যে কোন্‌টা রাখবি বল্।'

'যেটা হয় রাখো,' অরুণা বললে, ধরা গলায়।

সাড়ির শোভা দেখতেই বিজয়া এত ব্যস্ত যে মেয়ের মুখের দিকেও ভালো করে' তাকালেন না। কাপড় নিয়েই নাড়াচাড়া করতে-করতে বললেন: 'এই গোলাপি রঙেরটায় তোকে বেশ মানাবে—তা ছাড়া, এ-রঙের সাড়ি একটাও তোর নেই।'

'বেশ, এটাই রাখো।'

'নাকি এই ব্লু রঙেরটা রাখবি? সেদিন অনাদিবাবুর মেয়ে এই রঙেরই একটা সাড়ি প'রে এসেছিলো না? জরির চুমকিগুলো ঝল্মল্ করে রাত্রে। গোলাপি রঙটায় ওগুলো বেশি খোলে না কিন্তু।'

অরুণা কিছু বলবার চেষ্টা করলো; বলবার মত কিছু খুঁজে পেলো না।

দু'হাতে দুটো সাড়ি নাড়াচাড়া করতে-করতে বিজয়া বললেন: 'কাপড় দুটো বেশ কিন্তু—ছাখ্। আর', যদিও কাপড়ওয়ালার কথাটা শুনে ফেলবার সুদূরতব সম্ভাবনাও ছিলো তবু তিনি গলা নামিয়ে খুব অন্তরঙ্গস্বরে বললেন, 'আর কী সস্তা। বারো টাকা চেয়েছিলো, আট টাকায় রাজি করিয়েছি। এ-কাপড়ই দোকানে ঝুলিয়ে রাখলে পনেরো টাকা।'

কিন্তু অরুণা কাপড়গুলো একটু ছুঁয়েও দেখলো না, দূর থেকে শুষ্কচোখে তাকিয়ে বললে: 'জাপানি বোধ হয়।'

'হোক্ জাপানি—জাপানি তো আর গায়ে লেখা থাকে না। দেখতে-শুনতে আসল জরজ্জেটের চেয়ে খারাপ নাকি? ফিরিওয়ালারা হ'য়ে কত সুবিধেই হয়েছে! নিজেরা দেখে-শুনে রাখা যায়, আর আদ্ধেক সস্তা তো পড়েই, তায় বাকিও রাখা যায়।'

দস্তুরমত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন বিজয়া। দেখে কি মনে হয় না, কাপড়চোপড় তিনি সত্যি-সত্যি ভালোবাসেন—কিন্তু নিজের জন্য নয়, মেয়ের জন্য! নিজের সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই নেই তাঁর। অরুণা কখনো তাঁকে ছাখেনি মিলের সাদা সাড়ি ছাড়া কিছু পরতে। বড় জোর

মন্দিরে কি বিশেষ-কোনো নিমন্ত্রণে যাবার সময় লাল-পেড়ে গরদ। আছে তাঁর বাক্স বোঝাই হ'য়ে তাঁর যৌবনের রঙ-খেলানো চোখ-ঝলসানো সাড়ির স্তূপ: মন্তুর বৌয়ের জন্য যে-সব। যে-জরজেট নিয়ে এখন তাঁর এত উৎসাহ, অরুণা যদি প্রস্তাব করে তার একখানা তাঁর গায়ে উঠবে তাহ'লে তিনি এত স্তম্ভিত হবেন যে সারাদিন বোধ হয় আর ভালো করে' কথাই কইতে পারবেন না।

'তাহ'লে এই গোলাপিখানাই রাখি—উঁ?'

'রাখো।'

এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করে' বিজয়া বললেন: 'নাকি দু'খানাই রেখে দেবো? দাম তো পরে দিলেও চলবে।'

অরুণা হঠাৎ নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে বলে' উঠলো: 'না, না, কক্ষনো না। কক্ষনো তুমি দু'খানা রাখতে পারবে না, মা। এক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে এসো গে, যাও।'

বিজয়া একটু অবাক হ'য়েই মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। অরুণার উত্তেজনাটা একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গিয়েছিলো বুঝি—সে নিজেও লজ্জিত হ'লো। একটু শান্তভাবে বললে: 'পাগল হয়েছো তুমি, মা, দু'খানা রেখে কী হবে!'

'আহা—বলেছিলুম বলে'ই আমি যেন দু'খানা রাখতে গেছলুম। তুইও যেমন!' প্রত্যাখ্যাত সাড়িখানার উপর সস্নেহে শেষবার হাত বুলিয়ে তিনি সেখানা ভাঁজ করে' তুলে নিলেন। একটু থেমে বললেন: 'তুই স্নান করবিনে?'

'করবো'খন—এখনই কী হয়েছে!'

পারিবারিক

'চল্ আজ তোর মাথা ঘষে' দিইগে। আমার হাত খালি আছে এখন—চল্।'

'না, না—এখন না, মা, আজ না। আজ কিছুতেই মাথা ঘষবো না আমি।'

'লক্ষ্মী তো, চল্। নিজে তো ঘষবিনে কখনো, অযত্ন করে'-করে' সুন্দর চুলগুলোর কী দশাই করেছিস!'

অরুণার চুলের যে খুব দুর্দশা, তা সে এই অবিশ্যি প্রথম শুনলো; আর তা ছাড়া মায়ের এই সস্নেহ সম্বোধনও আজ অদ্ভুত লাগলো তার। মাথা নেড়ে বললে: 'আজ ইচ্ছে করছে না একেবারেই। আর এই তো সেদিন মাথা ঘষলুম কলেজের নাটকের দিন।'

'ওঃ, সে তো কবেকার কথা! একমাসের বুঝি বেশিই হবে।'

'হোক্‌গে। মাথা আবার লোকে রোজ-রোজ ঘষে নাকি?'

'আহা—আয় না আজ তোকে স্নান করিয়ে দিই নিজের হাতে ভালো করে'। সেই তো ঝুপঝুপ দু' ঘটি জল মাথায় ঢেলে কলেজে যাস্, ওকে কি আর স্নান বলে! গায়ে বুঝি সাতজন্মের মাটি পড়েছে।'

হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ লুকোনো কালো সাপের মত লাফিয়ে উঠলো অরুণার মধ্যে, মুহূর্ত্তে যেন পাথর হ'য়ে গেলো তার হৃৎপিণ্ড। বিজয়ার দিকে স্থির, গভীর দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো, কিছু বললে না।

বিজয়া আবার ডাকলেন, 'এই, চল্ না।'

'না, আমি এখন স্নান করবো না, তুমি যাও', বলে' অরুণা গিয়ে টেবিলের ধারে তার চেয়ারে বসলো। তার কথার সুরে, তার চোখে-মুখে

চলবার ধরণে এমন-কিছু ছিলো যাতে বিজয়া আর-কিছু বলতে সাহস পেলেন না। ঘর থেকে চলে' যেতে-যেতে নিচু গলায় শুধু বললেন :

'বাবাঃ—তোরা যে সব কী হচ্ছিস দিন-দিন, কথা কইলেই যেন গায়ে ফোস্কা পড়ে।'

অরুণা চুপ করে' বসে' রইলো, টেবিলের উপর দু' কনুই আর হাতের মধ্যে মাথা রেখে। সমস্ত শরীর যেন তার অসাড় হ'য়ে গেছে। সে জানে, সে নিশ্চিত জানে ; তার সেই ভয়ানক সন্দেহই যে সত্য, এক মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে কেমন করে' সে তা বুঝে ফেলেছে। কথাটা একবার যখন মনে পড়লো, তখন আরো নানারকম প্রমাণ পেতে দেরি হ'লো না। সকাল থেকেই বাবা-মার মধ্যে একটা চাপা ব্যস্তভাব। তাঁরা অবিশ্যি রোজই ব্যস্ত, সব সময়েই ব্যস্ত ; কিন্তু আজকের ব্যস্ততাটা একটু অন্যরকম, তার মধ্যে একটু যেন দুশ্চিন্তার আমেজ। চায়ের ফাঁকে-ফাঁকে নিম্নস্বরে একটু কথা দু'জনে, এ-রকম তো ওঁরা কত সময়েই বলেন, তখন অরুণা কিছু বোঝেনি। তারপর সাড়ি কেনা হ'লো, অঙ্গমার্জনা ও কেশসাধনার জন্য পিড়াপিড়ি, তারপর…তারপর। যে-চিঠিটা তার হাতে পড়েছিলো তাতে তো ও-কথা স্পষ্ট লেখাই ছিলো, যদিও তারিখ উল্লিখিত ছিলো না।

অরুণা দু' আঙুলে চোখ টিপে ধরলো। আর তার বোজা চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো জ্বলন্ত-নীল নরক। অতি সাদা কথায় বলতে গেলে এই : এক ভদ্রলোক তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব ভেবে দেখতে সম্মত ; তিনি আজ বিকেলে সবান্ধবে তাদের বাড়িতে আসবেন, আর

তাকে স্নানমার্জিত চিক্কণ দেহ নিয়ে গোলাপি রঙের জরজেট পরে' তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কথাটা কী করে' সে অমন নির্লজ্জ স্পষ্টতায় ভাবতে পারলে! তখনই অবাক লাগলো তার। প্রতিটি কথা যেন কোনো পিচ্ছিল সমুদ্র-সরীসৃপ; চারদিক থেকে তাকে জড়াতে আসছে লিকলিক কিলবিল করে'। পারবে না, কিছুতেই পারবে না সে; মরে' গেলেও পারবে না।

কিন্তু এই বা কেমন যে মা-বাবা আগে তাকে কিছু বলবেন না! যে-ঘটনা একশোতে সাতানব্বুইজন হিন্দু মেয়ের ভাগ্যেই হয়-তো একাধিক-বার ঘটে, এ-পর্য্যন্ত তার জীবনে কখনো সেটা ঘটেনি। ভাবেনি, কখনো ঘটতে পারে। এখন তার বয়েস উনিশ। সে নেহাৎ অন্ধ, কুনো হ'য়ে নেই; সে একটু লিখতে-পড়তে পারে, একটু ভাবতে পারে, পৃথিবীর বৃহৎ জীবনের কল্লোল একটু তো লেগেছে তার কানে—তার ব্যবস্থা এই মা-বাবাই করিয়েছেন। কী করে' তাঁরা ভাবতে পারলেন যে তার বয়েসের ও পরিণতির মেয়েকে…একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করলেন না। ঠিক এমনি হয়-তো কত মা-বাবাই করছে ঠিক তারই মত কত মেয়েকে প্রতিদিন ঘরে-ঘরে। কিন্তু সে ভেবেছিলো তার মা-বাবা অন্যরকম। ভুল করেছিলো ভেবে। ও আমাদের মেয়ে, ওকে যা-ই করতে বলবো তা-ই করবে। হ'তো যদি সে হাড়ে-মাংসে জড়ানো একটা বস্তা…তাহ'লে কোনো ভাবনাই ছিলো না। তাহ'লে তাঁরা অনায়াসে পারতেন সেই বস্তাকে রঙদার সাড়ি পরিয়ে চুল এলিয়ে দিয়ে হাত ধরে' বিবাহেচ্ছু পুরুষের সামনে উদ্‌ঘাটন করতে। কিন্তু তা তো নয়: তার হৃদয় আছে, আছে স্বতন্ত্র অনুভূতি, তার বুদ্ধি আছে, আছে বিচারশক্তি, আছে রুচি আশা ইচ্ছা—

এমনকি, অনিচ্ছাও আছে। সে মানুষ, সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা। এই অতি সহজ, অতি বৃহৎ কথাটা কী অনায়াসে তার মা-বাবা ভুলে গেলেন। আশ্চর্য্য, তাঁরা কি অন্ধ? প্রথা-অন্ধ তাঁরা, তাই এই অশ্লীল প্রথার সামনে মেয়ের চরম অপমানেই তাঁরা আজ উৎসুক। স্থূলবুদ্ধি দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রই তো হরণ করতে চেয়েছিলো, তাকে পণ্যের মত সাজিয়ে সম্ভাব্য প্রভুর সামনে জাহির করাবার সূক্ষ্মতরো ও দারুণতরো অবমাননা তার মাথায় আসেনি। তবু তো শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বাঁচিয়েছিলেন: তাকে বাঁচাবে কে?

আর এদেশেই এককালে মেয়েরা হ'তো স্বয়ম্বরা, পুরুষকে জয় করতে হ'তো স্ত্রী নিজের বীর্য্যের প্রমাণে। তখন প্রেম মানেই ছিলো বিবাহ; প্রেমই ছিলো মিলনের হেতু ও সমর্থন। তখনকার দুর্য্যোধন দুঃশাসনরাও এ-নীতিকে মর্য্যাদা দিয়েছে; রাবণ ডাকাত ছিলো, রাবণ ছোটলোক ছিলো না। সেই দেশ আজ অন্ধ মূঢ় নির্বোধ নিষ্ঠুর, সেই দেশ মৃতপ্রথাগত ব্যভিচারে কলুষিত। প্রথা নীতির প্রতিচ্ছায়া; নীতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি। যে-সব অবস্থায় পুরোনো নীতি ও তার ফলরূপী প্রথা সম্ভব হয়েছিলো, সে-সব অবস্থা যে একেবারেই গেছে বদলে; এখনকার অবস্থায় সে-সব প্রথা আরোপ করাও যা, পচা মড়া আঁকড়ে পড়ে' থাকাও তা-ই। ন'বছরের জড়বুদ্ধি মাংসপিণ্ড মেয়েকে কনে'-দেখানো সম্ভব ছিলো, অসঙ্গতও ছিলো না, কিন্তু যে-মেয়ে পূর্ণবয়স্কা, যে-মেয়ে দিনের আলোয় পৃথিবীকে দেখেছে, তাকে নিয়ে—ছী-ছী-ছি! অরুণার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঘৃণার একটা হিংস্র ঢেউ উত্তাল হ'য়ে উঠে মিলিয়ে গেলো।

এই প্রথা-পীড়িত দেশকে কোন্ কৃষ্ণ ত্রাণ করবে? কিন্তু একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত : নিজের উপর এই জবরদস্তি সে হ'তে দেবে না; কিছুতেই : পারবে না, কিছুতেই পারবে না সে।

এমনি অরুণা বসে' রইলো, বেলা বাড়লো। বেলা বাড়লো, বাইরে হাওয়া উঠলো তেতে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর আকাশে। নিচে থেকে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিনের জীবনের শব্দ : কলতলায় ঝি কাপড় কাচছে ছপছপ করে', পিণ্টুরা উঠোনে মার্বেল খেলছে, তার ঠোকাঠুকি; সাইকেলে করে' কে এলো ক্রিঙক্রিঙ। কে এলো? হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো অরুণার হৃৎপিণ্ড। না, সে নয়, সে নয়। সে যেন আজ আসে না। কাটলো অনেকক্ষণ, কেউ এলো না তার ঘরে, বাঁচা গেলো।

বাঁচা গেলো, কেউ যেন আর না আসে তার ঘরে; কেউ যেন আজ আসে না তাকে বিরক্ত করতে। আজ সে একেবারে একা, একেবারে বিচ্ছিন্ন; চারদিকে জীবনের জল ছল্‌ছল্ করে' বয়ে' যাচ্ছে, তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে যেন চলে' গেছে অনেক দূরে, বাড়ন্ত বেলার ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের ঐ আকাশে; সে আজ মূলহীন, ভিত্তিহীন, আসক্তিহীন, নিকট পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমস্ত যোগ একমুহূর্তে তার কেমন করে' ছিঁড়ে গেলো; পালকের মত হালকা লাগছে নিজেকে, পালকের মত নিশ্চিন্ত, স্বাধীন; এই বিশাল জ্বলন্ত আকাশের নিচে এই তপ্ত অবাধ হাওয়ায় একটুখানি পালকের মত ভাসছে সে।

বেলা আরো বাড়লো।

চৌদ্দ

তারপর বিজয়া এলেন। এই রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছেন, গায়ে ঈষৎ পেঁয়াজের গন্ধ।

'এ কী অরুণা, এখনো তুই এখানে বসে' আছিস যে?

'কী করবো?'

অরুণা চেয়ার ছেড়ে উঠলো না, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে মার দিকে তাকালো ঋজু সংহত দৃষ্টিতে।

'কী করবো! বাঃ, বেশ মানুষ তুই! নাইতে হবে না? খেতে হবে না?'

অরুণা কপালের উপর আস্তে হাত বুলিয়ে বললে: 'শরীরটা ভালো লাগছে না মোটেও।'

'ভালো লাগছে না!' বিজয়ার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আশঙ্কা যা নিছক মেয়ের স্বাস্থ্যহানির জন্য নয় নিশ্চয়ই।

'বোধ হয় জ্বর হবে।'

'জ্বর হবে! বলিস্ কী! দেখি, দেখি', বিজয়া তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়ের কপালে হাত রাখলেন। 'কই, না তো! অত বেলা করে'

ঘুম থেকে উঠেছিস, তাইজন্যেই গা-ম্যাজম্যাজ করছে। তখন বললুম, আয় স্নান করিয়ে দিই—শুনলি না তো! স্নান করলেই ভালো লাগতো দেখতিস্।'

অরুণা নাড়ি টিপে ধরে' বললে: 'একটু বোধ হয় জ্বরই হয়েছে।'

'কিসের জ্বর! স্নান করে' খেলেই সেরে যাবে। আজ শরীর খারাপ হ'লে উপায় আছে নাকি! আজ তোকে দেখতে আসবে যে!'

বিজয়া এত সহজে বললেন কথাটা যেন কোনো বন্ধু বেড়াতে আসবে কি যেতে হবে কোনো সুখকর নিমন্ত্রণে।

অরুণার মুখে এতটুকু ভাবান্তর হ'লো না। শান্তভাবে বললে: 'সত্যি অসুখ করেছে আমার। শুয়ে থাকবো এখন।'

বলে' সে চেয়ার ছেড়ে উঠেই দাঁড়ালো, যেন এখনই শুয়ে পড়বে।

বিজয়া চোখ কপালে তুলে বললেন: 'পাগল হ'লি নাকি তুই? আমি তোকে বলছি, কিছু হয়নি তোর। চারটের সময় ওরা আসবে—বেলায় নেয়ে-খেয়ে চেহারাটা দাঁড়কাকের মত করে' না-রাখলে কি চলে না?'

অরুণা একবার গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে: 'তুমি এখন যাও, মা।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয়া বুঝলেন। ঐ-রকম ঢঙ আজকালকার মেয়েরা করে কখনো-কখনো, তিনি শুনেছেন। এর প্রশ্রয় দিতে নেই। কঠিনকণ্ঠে বললেন: 'অরুণা, অবাধ্যতা কোরো না, বলছি। যাও শিগগির স্নান করে' এসো—এক্ষুনি যাও।'

অরুণা বললে, 'স্নান আমি আজ করবো না।'

পারিবারিক

'ছাখো অরুণা, তোমাদের অনেক আবদার অনেক অত্যাচার আমি সয়ে' আসছি সমস্ত জীবন। এখন আর জ্বালিয়ো না—যাও। যা বলছি, তা-ই করো।'

'কী বলছো তুমি ?' প্রশান্ত উদাসীনতায় অরুণা জিজ্ঞেস করলে।

'কী বলছি কানে ঢুকছে না, না ? এ-রকম অসভ্যতা কোথায় শিখলি তুই ? এমনিতে তো সংসারের হাজার তাড়নায় আমার হাড় থেকে মাংস আলাদা হ'য়ে গেলো—তার উপর তোদের এ-রকম অলক্ষ্মীপনা কি না-করলেই নয় ? বলছি, তোকে আজ দেখতে আসবে—তা মেয়ের যেন কানেই ঢুকছে না।'

'কে আসবে ?'

'যেই আসুক্, তোর তাতে কী ? আসবে—ছেলে নিজেই আসবে। কী বেহায়া বাবা তোরা আজকালকার মেয়েরা ! ওরে, এখন তো কতরকমই করবি—তারপর, প্রজাপতির দয়ায় যদি হ'য়ে যায়, ছদিন পরে তো আমাদের কথা মনেও পড়বে না।'

অরুণা একটু চুপ করে' রইলো, তারপর বললে : 'ওঁদের একটা খবর পাঠিয়ে দাও বরঞ্চ।'

'খবর—কাদের ?'

'যাদের আসবার কথা। বলে' পাঠাও না আসেন যেন।'

বজ্রাহতের মত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিজয়া।

'কী বললি তুই ?'

'বললুম ওঁরা যেন আজ না আসেন।'

বিজয়া ভালোমত নিশ্বাস নিতে না-পেরে কয়েকবার ঢোঁক গিললেন।

অরুণা আবার বললে : 'আমি ওঁদের সামনে যেতে পারবো না—আমার শরীর খুব খারাপ।'

হঠাৎ, কোন্ গূঢ় প্রবৃত্তির পরিচালনায়, বিজয়া দ্রুত পা ফেলে একেবারে মেয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, তারপর তেমনি তাড়াতাড়ি পিছনে হেঁটে আগের চেয়েও দূরে সরে' গেলেন।

'এই—এই তোর মনে ছিলো', অপ্রকৃতিস্থ বিলাপের মত বিজয়া বলতে লাগলেন। 'ওরে হতভাগা মেয়ে, এই ছিলো তোর মনে!, না—আমরা যা বলি তা তোকে করতেই হবে, বুঝলি—করতেই হবে তোকে। এ কি ইয়ারকি পেয়েছিস নাকি তুই? তোর বিয়ের কথা ভেবে-ভেবে এদিকে আমাদের রাত্রে ঘুম হয় না—তোর বাবার চুলগুলো সাদা হ'য়ে যাচ্ছে, দেখছিস না? আর তুই কিনা এখন বলিস—অরুণা, লক্ষ্মী তো, আজকের দিনে কোনো গোঁয়ারতুমি করিসনে—তুই তো এমন ছিলি না কখনো, তুই তো স্বমন্ত্র নোস—কত ঠাণ্ডা কত ভালো কত বাধ্য তুই—অরু, আর অশান্তি বাড়াস্‌নে—'

দু' আঙুলে মাথার দু'দিক চেপে ধরে' অরুণা বললে : 'পারবো না, কিছুতেই পারবো না আমি।'

বিজয়া অসহায়ের মত ঘরের দেয়ালের দিকে, তারপর মেয়ের মুখের দিকে, তারপর নিজের হাতের তেলোর দিকে তাকালেন। বেয়াড়া যৌবনের এই স্পর্দ্ধা কী করে' ঠেকাবেন তিনি? অরুণা হঠাৎ অনেক বড় হ'য়ে উঠলো তাঁর চোখে—সেই তাঁর কোলের মেয়ে, হাজার সুখ-দুঃখের মেয়ে—সে যেন হঠাৎ স্বতন্ত্র বিশাল ভয়ঙ্কর একটা সত্তা হ'য়ে উঠলো,

বিজয়া তাকে চেনেন না, তাকে কখনো দেখেননি। আজ প্রথমবার তাকে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন তিনি।

এই ভীষণ নতুন অরুণা আবার বললে : 'তুমি যাও মা, এখন।'

এ যেন আদেশের স্বর, দু'জনের মধ্যে অরুণাই জয়ী, প্রবৃত্তিতে লাগলো সেই চেতনা। তিনি প্রায় দরজার দিকে এক পা এগোলেন, তারপর হঠাৎ থমকে গেলেন, যেন নতুন কোনো ভয়ের ছায়া দেখে।

ঙয় ঘরে ঢুকলো দু' পায়ে, বিজয়াকে দেখে বললে : 'বক্সিবাজার থেকে লোক এসেছে।'

'কী বলছে ?' শুকনো গলায় বললেন বিজয়া।

'বলছে—ওঁদের চারটের সময় আসবার কথা ছিলো, তিনটের সময় আসবেন—'বিকেলের দিকে আরো কী কাজ আছে।' তারপর হৃষীকেশ-বাবু নিজেই মন্তব্য করলেন :

'হয়-তো অন্য কোথাও মেয়ে দেখতেই যাবে। অন্য যে-কোনো লাইনের মত এতেও আজকাল মারাত্মক কম্পিটিশন।'

নিবিড় অদ্ভুত স্তব্ধতা নামলো ঘরে। বিজয়ার সাহস হ'লে না মেয়ের দিকে তাকাতে, সাহস হ'লো না। কেমন করে' তিনি পারবেন প্রচণ্ড একটা ঝড়কে মেয়ের গায়ে লেলিয়ে দিতে ! আতঙ্কে ছোট হ'য়ে গেলেন তিনি। কী বোকা মেয়েটা, কী বোকা ! এখনো ও কিছু বলুক, এখনো বাঁচুক। নয় তো ওর বাপের রাগের অগ্ন্যুৎপাত থেকে কে ওকে বাঁচাবে, কে ওকে রক্ষা করবে তখন ! নিজের অজান্তেই তিনি একটু সরে' এলেন, নিজের শরীর দিয়ে অরুণাকে ঢেকে।

কিন্তু অরুণা সরে' এসে বাপের মুখের দিকে তাকালো। আস্তে বললে: 'এ-সব কথা আমাকে তো তোমরা কিছু বলোনি।'

হৃষীকেশবাবুর মুখের চামড়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে কুঁকড়ে গেলো।—'কী বলছো তুমি? তোমাকে আবার বলবো কী?'

'ব্যাপারটা যখন আমাকে নিয়েই, তখন আমাকে একটু বলতে পারতে তো।'

হৃষীকেশবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন: 'তুমি ছেলেমানুষ—এ-সব শোনবার দরকার কী তোমার।'

অরুণা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে' থেকে বললে: 'বাবা তোমাকে একটা কথা বলি।'

নীল হ'য়ে গেলো বিজয়ার মুখ। স্নায়ুতে-স্নায়ুতে স্তব্ধ হ'য়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়। এখনো হয়-তো সময় আছে, এখনো হয়-তো কিছু বলে' মেয়েকে বাঁচানো যায়। বলবার চেষ্টাও করলেন তিনি—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না।

হৃষীকেশবাবু মৃদু হেসে বললেন: 'তুমি কিছু বলবে?—বলো। তুমি কিছু ভেবো না, তোমাকে সৎপাত্রের হাতেই দেবো।'

'বাবা, যে-লোক এসেছে তাকে তুমি বলে' দাও ওঁরা যেন না আসেন। আমি পারবো না।'

'পারবে না? কী পারবে না তুমি?'

'ওঁদের সামনে যেতে পারবো না।'

'ওঁদের—সামনে—যেতে, পারবে না?' হৃষীকেশবাবু থেমে-থেমে কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন—যেন না-বুঝে।

অরুণা আবার বললে, যেন নিজের মনে মনে : 'পারবো না, কিছুতেই পারবো না আমি।'

হৃষীকেশবাবু একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, একবার তাকালেন স্ত্রীর দিকে। দূর থেকে মেঘের গুরু-গুরু যেমন শোনা যায়, তেমনি সুরে তিনি বললেন : 'মা-মেয়েতে এই পরামর্শ ই তাহ'লে চলছিলো এতক্ষণ !'

অরুণা হঠাৎ তীব্রস্বরে বলে' উঠলো : 'মাকে তুমি কিছু বোলো না, বাবা, মা তো—'

কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে পারলো না, বাজ ভেঙে পড়লো একেবারে মাথার উপর :

'অদৃষ্ট ! এতক্ষণে বুঝলাম—সবই অদৃষ্টের চক্রান্ত, নয়তো সকলেই একসঙ্গে আমার শত্রু হবে কেন ? সব—সব একত্র হ'য়ে আমার শত্রুতা করছে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী। মন্তু যেদিন আমাকে মুখের উপর ও-রকম বললে, সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো ! কাউকে বলিনি সে-কথা, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা চৌচির হ'য়ে গিয়েছিলো ও যখন বললে আমার টাকা ও আর চায় না। কিসের স্ত্রী পুত্রকন্যা—সবই টাকার খেলা সংসারে ! যতদিন অজস্র টাকা দিতে পেরেছি, ছেলে আমার খুব ভালো ; আর এখন অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়েছে, তুচ্ছ ছেলে আমার কী বললেন—না, চাইনে আর তোমার টাকা ! যেমন করে' পারি আমাকে দিতেই হবে যে ! ওর জন্মের জন্যে আমিই

হৃষীকেশবাবু উদ্দাম, উন্মাদভাবে হো-হো করে' হেসে উঠলেন। তাঁর মুখে ক্রোধের আর ক্ষোভের অসংখ্য কুটিল রেখা, বলতে-বলতে তাঁর

দুই বলিষ্ঠ বাহু দুটো মুগুরের মত ওঠাপড়া করছে। স্তব্ধ, স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো মা-মেয়ে।

'আমিই দায়ী—আমি তো সে-কথা জানতুম না, মন্তু আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সে-দায় কি আমি এত বছর ধরে' মোচন করিনি, তিলে-তিলে পলে-পলে প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে? পিতার কর্তব্য থেকে আমি ভ্রষ্ট হয়েছি কি কখনো? আমার নিজের জীবনের কী সুখ, কী স্বাচ্ছন্দ্য, কী আরাম! সে-কথা মনেও হয়নি কখনো! টাকা রোজগার কম করিনি জীবনে—তোদের সুখের জন্যেই সব ঢেলেছি, তাতেই আমার সুখ। মিথ্যা—সব মিথ্যা। আমার বড় ছেলে যেদিন আমাকে অমন করে' বললে—সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো। ওরে তুই তো মেয়ে তুই তো জন্ম-পর, তোর কথা আবার আমার গায়ে লাগে নাকি? কিন্তু এটা মনে রেখো এখনো তুমি আমারই মেয়ে, এখনো আমার কথা তুমি মানতে বাধ্য। আজ তিনটের সময় যাঁরা আসবেন, তাঁদের সামনে তোমাকে যেতেই হবে, এই আমি বলে' দিলাম। যদি না যাও—'

হৃষীকেশবাবু দু' বাহু উদ্যত করে' ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গি করলেন। সেটা অভিশাপের না আঘাতের না অসহ্য আত্ম-ধিক্কারের কে বলবে! আর বিজয়া হঠাৎ পাগলের মত ছুটে এসে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন: 'পায়ে পড়ি তোমার, ওকে মেরো না। ওকে মেরো না তুমি—ও ছেলেমানুষ, ওর কোনো দোষ নেই।'

অরুণা দু' হাতে তার মাকে জড়িয়ে ধ'রে টেনে এনে তার বিছানার উপর বসিয়ে দিলে। তারপর বললে: 'বাবা, আমাকে তুমি মারতে

পারো, আমাকে তুমি মেরে ফেলতে পারো,' কিন্তু মরে' গেলেও আমি পারবো না।'

'তুমি পারবে না—তুমি তো পারবে না, এদিকে আমার কী দশা হবে? ভদ্রলোকরা আসবেন—তাঁদের কাছে আমার মান থাকবে কোথায়! কী বলবো আমি তাঁদের, কী বলে' আমি মুখ দেখাবো তাঁদের—'

'সেইজন্যেই তো বলছি আগেই খবর পাঠাও। বলে' পাঠাও আমার অসুখ করেছে।'

'তারপর! ছেলের ছুটির মেয়াদ বুঝি ফুরিয়ে গেলো—তারপর!'

'তারপর আবার কী! এখানে তো আমার বিয়ে হবে না।'

'এখানে তোমার বিয়ে হবে না!'

'না, হবে না।'

'কেন হবে না জানতে পারি?'

'আমার ইচ্ছে নেই।'

একটা অসম্বরণীয় উন্মত্ত ঝোঁকে থর্‌থর্ করে' কেঁপে উঠলো হৃষীকেশ-বাবুর সমস্ত শরীর। দাঁতে দাঁত ঘষে' বলে' উঠলেন: 'তোমার ইচ্ছে নেই! তোমার জীবনের পরম কল্যাণের চেষ্টায় আমি প্রাণান্ত হচ্ছি—আর তাতে তোমার ইচ্ছে নেই! এখন আমার অবস্থা কি জানো না? তোমার বিয়েতে কতগুলো টাকা লাগবে জানো না? চাকুরে ছেলের বাপ তো নগদই হেঁকে বসেছেন চার হাজার। তবু আমি পেছ-পা হইনি। ধার করে' হোক্, সর্ব্বস্ব বেচে হোক্, সে-টাকা আমি জোগাড় করবোই। তুমি সুপাত্রে পড়বে, তুমি সুখী হবে—এ-ই তো আমার আশা।

ভদ্রলোকদের আমি কথা দিয়েছি, সব প্রায় ঠিকঠাক—এখন তুমি কিনা বলছো তোমার ইচ্ছে নেই !'

'আমাকে তো আগে কিছু বলোনি। আমাকে না-বলে' তাঁদের কথা যেমন দিয়েছো—'

'চুপ !' বজ্রের গর্জনে বলে' উঠলেন হৃষীকেশবাবু, 'চুপ করো ! তুমি ! তোমাকে আবার বলবো কী ! তোমার আবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কী ! নিজের ভালো-মন্দ, নিজের সুখদুঃখ তুমি কি কিছু বোঝো ? আমি যা বলবো তা-ই তুমি করবে, তা-ই তুমি করতে বাধ্য। এই আমি বলে' দিলাম—এই এখানেই তুমি বিয়ে করবে, করবে, করবে। তোমার তুচ্ছ ছেলেমানষি খেয়ালের জন্য এ-বয়েসে আমি অপদস্থ বেইজ্জৎ হ'তে পারবো না।'

অরুণা দ্রুতপায়ে হেঁটে বাপের একেবারে কাছাকাছি মাথা তুলে দাঁড়ালো, সেই প্রভু-পুরুষের ভীষণ মূর্ত্তির মুখোমুখি।

'তোমার তো ইজ্জৎ আর মান—আর আমার কী ? আমার জীবন ! আমার সমস্ত জীবন—আমার সমস্ত সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা। আমার জীবন নিয়ে তুমি খেলা করছো কোন্ অধিকারে ! তোমারই বা কোন্ বৃহৎ কর্ত্তৃত্বের খেয়ালে আমাকে আজ দাবার ঘুঁটি হ'তে হবে, পণ্য হ'তে হবে, রঙিন সাড়ি পরে' গিয়ে দাঁড়াতে হবে অপরিচিত পুরুষের চোখের সামনে রাস্তার নির্লজ্জ স্ত্রীলোকের মত। আমার বাপ হ'য়ে এ-প্রস্তাব করতে লজ্জায় তুমি মরে' গেলে না ?'

অরুণার ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, চোখ তার উদ্দাম, আগুনে ভরা, চুল তার বিশৃঙ্খল, ছোট-ছোট দাঁত দিয়ে ঠোঁটের এককোণ কামড়ে ধরেছে।

ভেঙেছে বাঁধ, জেগেছে জোয়ার, এখন সে সব করতে পারে, সব বলতে পারে—এতদিনের 'চাপা সুরঙ্গ-গুমরানি আজ হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে সর্ব্বনেশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে।

স্তব্ধ, স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন হৃষীকেশবাবু মেয়ের এই অভাবিত, অভাবনীয় মূর্ত্তির দিকে। তারপর নিলেন চোখ নামিয়ে, আস্তে বসলেন গিয়ে টেবিলের ধারের চেয়ারটায় মাথা নিচু করে। একটু পরে বললেন:

'এখন বুঝতে পারছি তোমাকে শিক্ষা দিতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে।"

'নিশ্চয়ই', তৎক্ষণাৎ বলে' উঠলো অরুণা। 'ঠিক বলেছো। সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমাকে লেখাপড়া শেখানো। যদি আমাকে দিয়ে এই পুতুল-নাচ খেলানোই তোমার উদ্দেশ্য ছিলো, তাহ'লে উচিত ছিলো আমাকে মূর্খ নির্বোধ নিরক্ষর রাখা। তাহ'লে আমাদের কাউকেই আজ এত দুঃখ পেতে হ'তো না, এত দুঃখ দিতে হ'তো না।'

খাটের এককোণে মূর্চ্ছিতের মত পড়ে' ছিলেন বিজয়া, চেষ্টা করে' বললেন: 'অরু, তুই চুপ কর্, তুই আর বলিস্‌নে, তুই এদিকে আয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন হৃষীকেশবাবু: 'ঈশ্বর, এ-ও আমার কপালে ছিলো! আমি তো পাপ করে' তোদের জন্ম দিইনি—কেন তোরা এমন করে' আমাকে মেরেছিস!'

আর এক মুহূর্ত্তে অরুণার ভিতরটা যেন টুকরো-টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে গেলো। কী সে করছে, ভালো করে' বুঝতেও পারলে না, ছুটে গিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে' বললে: 'বাবা, শোনো, আমার কথা শোনো।'

হৃষীকেশবাবু ক্লান্ত, আরক্ত চোখে তাকালেন।

'বাবা, আমার উপর রাগ কোরো না, আমি এখন একটা কথা বলবো। তুমি তো পুরুষমানুষ, তুমি তো কত দেখেছো, কত জেনোছো, তুমি বুঝবে। বিয়ে আমি করবো না, এমন কথা তো আমি বলিনি। তোমরা আমার বিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো, বিয়ে আমি করবো। একটি পয়সাও খরচ হবে না তোমার—কত সুখী আমি হ'বো, কত সুখী তোমরা হবে। সে খুব ভালো বাবা, সে খুব ভালো।'

হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন: 'সে! সে কে? কার কথা বলছো তুমি?'

আর সঙ্গে-সঙ্গে অরুণার হৃৎপিণ্ড অতল পাতালে তলিয়ে গেলো, বিকট দুঃস্বপ্নের মত আতঙ্ক যেন তার কণ্ঠনালী আঁকড়ে ধরলো। রুদ্ধস্বরে বললে: 'বাবা, আমি অশোককে বিয়ে করবো।'

সঙ্গে-সঙ্গে বিজয়া যেন বিদ্যুৎপ্রহৃত হ'য়ে উঠে বসলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে হৃষীকেশবাবুর হুঙ্কারে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠলো—'কী! কী বললে তুমি!'

বিজয়া উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়ে বললেন: 'অশোক! অশোককে বিয়ে করবি!'

'ও, তাই!' হৃষীকেশবাবু অরুণার হাত তাঁর গলা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, ছিটকে মেঝেতে লুঠিয়ে পড়লো অরুণা। 'তাই! এতক্ষণে বোঝা গেলো ব্যাপারটা। সেইজন্যেই ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে থাকবে কেন? মনে যখন কুপ্রবৃত্তি জেগেছে, অন্য-কিছুতে তো ইচ্ছা থাকবেই না!'

আর বিজয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন: 'অশোককে তুই বিয়ে করবি কী! পাগল! অশোক যে বস্তি, ওরা যে অন্য জাত—এমন কথা

স্বপ্নেও কী করে' ভাবলি তুই! অশোককে তো আমি নিজের ছেলের মতই ভালোবাসতুম—ছেলেটা এমন বদ্ কে জানতো! ও-ই তো নষ্ট করেছে মেয়েটাকে, ও-ই তো মন্ত্র পড়িয়েছে কানে—নয় তো এমন শান্ত এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার—' দুঃসহ আবেগের তোড়ে বিজয়ার গলা বুজে এলো, কথা শেষ করতে পারলেন না।

'আমার রক্তে জন্ম নিয়ে তুই আজ ছেনালি ক'রে বেড়াচ্ছিস।' হৃষীকেশবাবু হাড়-কাঁপানো চীৎকার করে' বলতে লাগলেন। 'এমন সন্তান না-থাকলে কী হয়! টুকরো করে' তোকে যদি কেটে ফেলি—কী করতে পারিস তুই? উচ্ছন্নে যাবি, পচে' মরবি তুই—বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' কোনো সন্তান কখনো সুখী হয়নি পৃথিবীতে।'

ভয়ে পাগল হ'য়ে গিয়ে অরুণা দু'হাতে বাপের দুই পা জড়িয়ে ধরলো।—'বাবা, অমন করে' শাপ দিয়ো না—সুখী হবো, আমরা সুখী হবো', বলতে ঝরঝর করে' সে কাঁদতে লাগলো, 'অমন করে' শাপ দিয়ো না তুমি। বাবা, মাগো, মা—তোমরা অমত কোরো না—আমি ওকে ভালোবাসি, ভালোবাসি—তুমিও যে মা-কে ভালোবাসো, বাবা, তেমনি, তেমনি—কিছু অন্যায় নয়, খারাপ নয়, আমরা বিয়ে করবো—বলো তো আজই, এক্ষুনি—ওকে বিয়ে না-করলে আমি বাঁচবো না, বাবা—মা, মাগো—তুমি একটু বলো, তুমি তো বোঝো—আলাদা জাতে কী হয়, এমন তো কতই হচ্ছে আজকাল—মা, তুমিই তো ওকে কত ভালো বলতে, ও তো ভালো, ভালো, সত্যি ভালো—ওর মত ভালো আর কে—একটু বলো না, মা, জাত দিয়ে কী হয়, সুখী হওয়াই তো আসল—বাবা, তুমি তো আমাকে সুখী দেখতেই চাও, তবে কেন কিছু বলো না—

বাবাগো, ওকে বিয়ে করলে আমি কত সুখী হবো দেখবে, তোমরাও সুখী হবে, তোমরাও—বাবা—'

কাঁদতে-কাঁদতে অরুণার গলা ভেঙে গেলো, উদ্দাম অশ্রু-উজ্জ্বল চোখ তুলে তাকালো বাবার মুখের দিকে।

হৃষীকেশবাবু পা দুটো সরিয়ে নিতে-নিতে বললেন: 'তমি নষ্ট মেয়ে—তুমি এখান থেকে যাও।'

তীরের মত সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো অরুণা। একটা তীর ছুটে যেতে-যেতে যেমন শব্দ করে' তেমনি স্বরে বললে: 'কী! আমি—নষ্ট মেয়ে!'

হৃষীকেশবাবু বললেন: 'তোমার ব্যবস্থা পরে করবো—এখন আমার চোখের সামনা থেকে যাও তুমি।'

অরুণা কিছু না-বলে' মাথাটা একবার ঝাঁকালো, তার শিথিল খোঁপা ভেঙে লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত পিঠে। আর তার চোখে কান্না নেই, তার পাৎলা বাঁকা ঠোঁটে ঈষৎ যেন হাসির ছায়া।

একটু সময়, মৃত্যুর মত স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে। হঠাৎ বিজয়া আর অরুণা দু'জনেই চমকে উঠলো হৃষীকেশবাবুর কণ্ঠস্বরে:

'কী হে, তুমি আবার এখানে কেন?'

দু'জনেরই চোখ একসঙ্গে দরজার দিকে গেলো। সুমন্ত্র এইমাত্র স্নান করে' এসেছে, গায়ে পাৎলা ফুরফুরে পাঞ্জাবি, সুন্দর করে' আঁচড়ানো চুল। এ-ঘরের কলরব সমস্ত বাড়ি থেকেই অবিশ্যি শোনা যাচ্ছিলো, সুমন্ত্রও শুনেছিলো। প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, একটু পরেই বুঝেছিলো ব্যাপারটা। সত্যি বলতে, এ-ক'দিন এই বিস্ফোরণেরই সে প্রতীক্ষা

করছে। ভিতর থেকে তক্ষুনি তার ঝোঁক হয়েছিলো উপরে ছুটে যেতে, অরুণার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। অতি কষ্টে চেপে গিয়েছিলো সেটা। হাজার হোক্, তার তো এতে কিছু নয়। পাছে নিজেকে সামলাতে না-পেরে চলে' যায়, গেলো স্নান করতে। কিন্তু স্নান করে' এসেও দেখলো, থামেনি। এখনো শোনা যাচ্ছে। আহা—বেচারার কত লাঞ্ছনাই না জানি হচ্ছে! তারপর বুঝি কানে এলো অরুণার একটু কান্নার শব্দ। আর পারলে না। মন স্থির করে' চলে' এলো উপরে।

হৃষীকেশবাবু বললেন: 'এসেছো যখন, খবরটা শুনেই যাও। তোমার ভগ্নী তোমার বন্ধু অশোক সেনকে বিয়ে করতে চায়। দস্তুরমত রোমান্টিক শোনাচ্ছে—কী বলো?'

সুমন্ত্র বললে: 'তা বিয়ে করতে চায় করবে, ভালোই তো।'

'আরে তুমি তো এ-কথা বলবেই। তুমি নিজে কোন্‌দিন এ-রকম একটা কাণ্ড করো তার তো কিছু স্থির নেই। কোন্ এক বেজাত বজ্জাত মেয়ে—তোমার মত ছেলের কপালে তার বেশি আর কী? সে যা-ই হোক্, তোমার বন্ধুকে তুমি বলে' দিয়ো সে যেন আর এ-বাড়িতে না আসে।'

'আমার বন্ধুকে আমি নিশ্চয়ই বলে' দেবো সে যেন আমার বাবার বাড়িতে আর না আসে।'

'বেশ বেশ, তা হ'লেই হ'লো। তোমার যখন নিজের বাড়ি হবে, তুমি তোমার অসভ্য ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে যত খুসি নাচানাচি মাতামাতি কোরো। ঈশ্বরের কাছে এই বলি অতটা যেন আমাকে আর দেখতে না হয়। তার আগেই যেন—'

পারিবারিক

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হৃষীকেশবাবু চুপ করে' গেলেন।

বিজয়া তাড়াতাড়ি বললেন: 'থাক্, থাক্, এখন চুপ করো তো তুমি। এই দুপুরবেলায় আর-একটা ষড়জাল না-বাধালে কি চলছে না? মন্তু, তুই নিচে যা।'

সুমন্ত্র বললে: 'একটা কথা জিজ্ঞেস করে' যাই। এ-বিয়ে কি হবে না?'

হৃষীকেশবাবু জবাব দিলেন: 'কী হবে না হবে তা তোমার জিজ্ঞেস করবার তো কোনো দরকার নেই।'

'তার মানেই হবে না। কেন হবে না জানতে পারি?'

'ফের! ফের তুমি কথা বলছো, মন্তু!'

অরুণা সুমন্ত্রর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে: 'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, তুমি যাও—তুমি নিচে যাও।'

তবু সুমন্ত্র বললে: 'তুমি যদি সত্যি তোমার মেয়েকে ভালোবাসতে, তাহ'লে এক্ষুনি এ-বিয়ের ব্যবস্থা করে' ফেলতে।'

শূন্যে হাত ছুঁড়ে গর্জন করে' উঠলেন হৃষীকেশবাবু: 'তাইতো, তাইতো! আমি তো আমার মেয়েকে ভালোবাসিনে, আমি তো আমার ছেলেকে ভালোবাসিনে—কোনোদিন তোদের কাউকে আমি ভালোবাসিনি! তোকে আগেই চিনেছিলাম, অরুণাকে আজ চিনলাম। এতদিন ধরে' তোদের জন্য প্রাণ দিয়েছি—আজ তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিচ্ছিস তোরা। অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম বেইমান সব—'

'কী করেছি আমরা যে তুমি এমন করে' বলছো! কী করেছি আমি? কি করেছে অরুণা? মেয়েটাকে যে আজ তোমরা এমন করে'

যন্ত্রণা দিচ্ছো, সাধ্য আছে তোমাদের অশোকের চেয়ে ভালো ছেলের হাতে ওকে দিতে পারো!'

'মন্তু, মন্তু—' আর্তভাবে ডেকে উঠলেন বিজয়া, 'চুপ কর্ তুই বাবা, যা এখান থেকে।'

কিন্তু সুমন্ত্র বলতেই লাগলো: 'দৈবক্রমে ও আলাদা জাত, তাতে কী হয়েছে! এত বড় নিষ্ঠুর তোমরা, তোমাদের একটা কুসংস্কারের খাতিরে মেয়েটাকে মেরেও ফেলতে পারো! এর নাম ভালোবাসা!'

চীৎকার করে' উঠলেন হৃষীকেশবাবু: 'অপোগণ্ড নাবালক শিশু—তোরা কী বুঝবি বাপ মায়ের প্রাণের কথা! আজ আমি এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে—তোদের যেন কখনো ছেলেমেয়ে না হয়, এ-কষ্ট তোরা যেন কখনো না পাস্ জীবনে!'

'কেন, কষ্টটা কী? কষ্ট তো তোমরা নিজেরা পাচ্ছো নিজেদের দোষে। ছেলেমেয়েকে কেবল ভালোবাসলেই হয় না, মানুষ হিসেবেও তাদের ভাবতে হয়। কী অন্যায় করেছি আমরা, কখন্ অকৃতজ্ঞতা করলাম! আমরা আলাদা মানুষ, আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তোমাদের সঙ্গে আমরা এক নই—এই তো আমাদের দোষ! কিন্তু এক হওয়া কি সম্ভব?'

'এই তো—এই তো ছাখো—অরুণা তার দাদার কাছেই দীক্ষা নিয়েছে বুঝি, তাকে আর দোষ দেবো কী! স্বাধীন—স্বাধীন হয়েছিস তোরা, এই একটা বুলি আজকাল তোদের মুখে। তোরা তো এখন স্বাধীন হ'লি—কিন্তু আমরা কি কখনো স্বাধীন হ'তে পেরেছি তোদের নিয়ে! এক-একটি সন্তানকে লালন করে' তোলা যে কী তা তোরা বুঝবি কেমন করে'! আর সেখানেই যদি শেষ হ'তো!'

পারিবারিক

'এ-কথা বার-বার শোনাচ্ছো কেন যে কষ্ট করে' আমাদের মানুষ করেছো! সে-কষ্ট তো সকলেই করে, সে তো করবেই! তার জন্যে কি এখন প্রতিদান চাও? যেটা প্রকৃতিরই নিয়ম সেটার জন্যে কি কেউ বাহবা চায়? যত কিছু করেছো আমাদের জন্যে এখন কি তারই দ্বিগুণ আদায় করে' নিতে চাও জোর খাটিয়ে, অত্যাচার করে'?

অরুণা আবার বললে, সুমন্ত্রর একটা হাত চেপে ধরে': 'চুপ করো, দাদা, চুপ করো।'

'স্নেহ দিয়েই তৃপ্ত', তবু সুমন্ত্র বলতে লাগলো, 'স্নেহ কিছু ফিরিয়ে চায় না। তোমরা ফিরিয়ে চাও—তোমরা চাও বাধ্যতা, দাসত্ব। ছেলে-মেয়েকে চাও হাতের মুঠোর মধ্যে। চাও নিজের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। তারা কী খাবে কী পরবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, কখন বেড়াবে ক'টার সময় শোবে—সব তোমরা বলে' দেবে। জীবনের তুচ্ছ থেকে বৃহত্তম সমস্ত ব্যাপারে একান্ত মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকবে তোমাদেরই। গৃহপালিত পশুরও নিজের আলাদা ইচ্ছা থাকে, তাও তাদের থাকবে না। তবে হ'লো গিয়ে ভালো ছেলে। আর সেই মূঢ় দাসত্বে যেই একটু ত্রুটি হ'লো অমনি জ্বলে' উঠে বললে—বেইমান নেমকহারাম অকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ! কৃতজ্ঞ থাকে চাকর, ছেলে কখনো কৃতজ্ঞ থাকে!'

'মন্তু', ধ্বজিয়া বলে' উঠলেন ব্যাকুলভাবে। 'মন্তু, চুপ কর্ তুই।'

হৃষীকেশবাবু হাত তুলে বললেন: 'বলতে দাও ওকে, বলতে দাও—সব শুনি। এ-বয়েসেও অনেকখানি বাকি ছিলো, দেখছি; পূর্ণ হোক্। ও তো বলবেই এ-রকম—ও তো জানে না কত রাত আমাদের জেগে বসে' কেটেছে ওকে নিয়ে, কত সুখে বাধা পড়েছে, ব্যর্থ হয়েছে কত সঙ্কল্প, নষ্ট

হয়েছে কত আশা। ও তো জানে না স্বাধীনতা বলে’ আমাদের কিছুই ছিলো না, এখনো নেই, এখনো আমাদের সমস্ত জীবন ওদেরই জন্যে ; ও তো জানে না শরীরের যত অসংখ্য দুর্ভোগ, মনের যত অসহ্য দুশ্চিন্তা, জানে না ব্যথা, জানে না সমস্যা, জানে না শিশুর প্রতিকারহীন অত্যাচার। বার-বার এমনি কেটেছে ওদের দিয়ে। তারপর আজ যখন ওদের জীবনের সিংহদরজায় প্রায় পৌঁছিয়ে দিলুম, ওরা আজ বলছে—ও তো তোমরা করতে বাধ্য !’

‘বাধ্য নও ?’ এক মুহূর্ত্ত দেরি না-করে’ বলে’ উঠলো সুমন্ত্র। ‘আমাদের জলে ভাসিয়ে দিতে তো পারতে না ! আর এ-কথা কি বলব যে যত-কিছু করতে হয়েছে তাতে কেবলই দুর্ভোগ আর দুশ্চিন্তা—তাতে কোনো সুখ ছিলো না, কোনো মাধুর্য্য ছিলো না ? আর সেই শৈশবটাই যেন চিরকালের—এমনি তোমাদের মনের ভাব। এমন দিন যে আসে যখন আমরা আর শিশু থাকিনে, এটাই যেন তোমরা মনে আনতে পারো না। একটা বয়েস পর্য্যন্ত আমাদের জীবন থাকে মা-বাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো : কিন্তু একদিন ছেদ আসে, একদিন ছেদ আসতেই হয়, না-এলেই সর্বনাশ। কুড়ি-বাইশ বয়েসের খোকাখুকু মানেই হাবা। তেমনি একদিন শিশু থাকে মাতৃগর্ভে নাড়ির পাকে-পাকে জড়ানো : কিন্তু সে-বন্ধন একদিন ছিঁড়ে যায়, সেটাই মুক্তি। পরবর্ত্তী জীবনে আর একবার আসে সেই ছিন্ন হবার, বিচ্ছিন্ন হবার সময়—সেটাকে স্বীকার করে’ নিতে না-পারা অপ্রকৃতিস্থতা। তখন নিজের ছেলেমেয়েকেও সম্মান করতে হয় স্বতন্ত্র মানুষ বলে ; মানুষের-সঙ্গে-মানুষের যে-সহজ অনাড়ষ্ট মুক্তির সম্বন্ধ, তা ছাড়া আর-কোনো সম্বন্ধ তখন টিকতেই পারে

না। যে-নিবিড় তীব্র বন্ধন অণুতে-অণুতে বাপ-মায়ের সঙ্গে শিশুর, তখন সেটা ছিঁড়ে ফেলতেই হয়—ছিঁড়ে যায়ই সেটা—নয় তো সে-স্নেহ নাগপাশ হ'য়ে উঠে উভয় পক্ষকেই পিষে মারে। দেখলে তো, এই স্নেহ নিয়ে জবরদস্তি করতে গেলে কী হয় দেখলে তো ? একবার এ-কথা তুমি মনে-মনে মেনে নাও যে আমরা বড় হয়েছি, তারপর দেখবে কোনো গোলমমালই আর থাকবে না।'

হৃষীকেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন :

'মন্তু, এত কথা তোমাকে কেন বলতে দিলুম জানিনে। কিন্তু অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি যাও—অরুণা, তুমিও যাও। বেরিয়ে যাও, তোমরা আমার চোখের সামনা থেকে, বেরোও এক্ষুনি। যেখানে খুসি যাও, যা ইচ্ছে হয় করো। তোমরা যে আমার কিছু, এটা যেন আমি ভুলতে পারি।'

*　　*　　*

তারপর আর সমস্ত বাড়িতে চুপি-চুপি একটা কথা বলা হ'লো না। হৃষীকেশবাবু স্নান করে' খেলেন, সুমন্ত্র গিয়ে একা-একা খেয়ে এলো। অরুণা নাইলো না, অরুণা খেলো না, শুয়ে রইলো বিছানায়। বিজয়া পড়ে' রইলেন না-খেয়ে মেঝেতে পাটি পেতে। বেলা গড়িয়ে চললো, তিনটে বাজলো। ভদ্রলোকরা এলেন, হৃষীকেশবাবু নিচে গিয়ে কী কথা কইলেন তাঁদের সঙ্গে আর-কেউ শুনলো না। ভদ্রলোকেরা চলে' গেলেন।

পনেরো

'টুনকি, শোন্।'

টুনকি বারান্দা দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিলো, দিদির ডাকে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আয় এখানে।'

টুনকি ঘরে ঢুকে কাছে এলো, নিঃসঙ্কোচে নয়।

তার দু' হাতের উপর দু' কাঁধ রেখে অরুণা বললে, 'শোন্ একটা কথা।'

বড়-বড় গম্ভীর শিশু-চোখ তুলে তাকালো টুনকি।

'শোন্—আমি যদি চলে' যাই এখান থেকে, কেমন হয় তবে বল্ তো ?'

'যাবে নাকি তুমি দিদি ?'

'বাঃ, যাবো না ! বিয়ে হবে না আমার ? তুইই তো বললি সেদিন।'

'কই, বিয়ে তো তোমার হ'লো না। তারা তো চলে' গেলো।'

'সব খবরই রাখিস দেখছি।'

টুনকি একটু লজ্জিতভাবে বললে : 'মা তো সেইজন্যেই এত কাঁদছেন !'

অরুণা হেসে বললে : 'দূর্ বোকা—মা-রা আবার কাঁদেন নাকি? বড়রা কি কাঁদে?'

টুনকি চুপি-চুপি বললে: 'তবে তুমি যে—'

'দূ—র্! আমি আবার কাঁদি নাকি? পিণ্টু কাঁদে, গোপ্লা কাঁদে, তুই কাঁদিস—'

টুনকি প্রতিবাদ করলে, 'আমি কাঁদিনে।'

অরুণা একটু চুপ থেকে বললে : 'শোন্, একদিন হয়-তো দেখবি আমি চলে' গেছি।'

'কোথায় যাবে?'

'কোথায় যাবো তা কি জানি?'

'তা আবার আসবে তো—আসবে না? দিদিরা বিয়ে হ'য়ে চলে' যায়—আবার তো আসে মাঝে-মাঝে, আসে না?'

'সবই তো জানো তুমি বুড়িঠাকরুন। তোমার আর ভাবনা কী?'

টুনকি বললে : 'তুমিও তো আবার আসবে?'

'যদি না আসি?'

টুনকি বললে : 'যাঃ!'

'যদি না আসি তবে কি তুই খুব রাগ করবি আমার উপুর?'

টুনকি মাথা নিচু করে' চুপ করে' রইলো।

অরুণা মেয়েটার কপালে একটা চুমু খেয়ে বললে : 'রাগ যত খুশি করিস্, কিন্তু তোর দিদিকে কখনো খারাপ বলে' ভাবিসনে—বুঝলি?'

টুনকি মাথা তুললো; তার চকচকে চোখের উপর চোখের পাতা পড়লো কয়েকবার।

হাত সরিয়ে এনে অরুণা বললে, 'যাঃ—যা এখন।'

টুনকি তবু দাঁড়িয়ে রইলো কোল ঘেঁষে।

অরুণা আবার বললে, 'আমায় খারাপ বলে' ভাবিসনে—কেমন ?'

টুনকি কিছু বললে না, কেমন অদ্ভুত করে' তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে। হয়-তো একটু পরে সে কিছু বলতো, কিন্তু তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন বিজয়া, আর মার পায়ের শব্দ পেয়েই টুনকি পালালো ছুটে।

অরুণা বসে' ছিলো খাটের ধার ঘেঁসে, বিজয়া তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। আস্তে বললেন : 'কত আর মন-খারাপ করে' থাকবি, অরুণা !'

অরুণা বাঁকা হেসে বললে : 'কই, মন-খারাপ করছিনে তো আমি।'

কিন্তু বিজয়া কথাটাকে প্রতিবাদেরও অযোগ্য মনে করলেন।

'মনে-মনে ও-রকম গুমরে-গুমরে শরীরটাকে খারাপ করবি তো ? তা ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। অরু, লক্ষ্মী, এত অবুঝপনা করিসনে।'

মা হয়-তো তার গায়ে একটু হাত বুলুতেই যাচ্ছিলেন, অরুণা ঈষৎ অলক্ষিত ভঙ্গিতে দূরে সরে' গেলো। বললে : 'থাক্ মা, এ-সব কথা থাক্।'

একটু চুপ করে' থেকে বিজয়া বললেন : 'তুই কি পাগল নাকি, অরু যে ঐ অশোক ছেলেটাকে বিয়ে করবার কথা বললি ? তা কি হয় কখনো ? ওর জাত যে আলাদা—ওর বাবা জানতে পারলে তিনিই কি রাজি হ'তেন, ভেবেছিস ?'

'কেন তুমি বোঝাচ্ছো, মা ? আমি তো কিছু বলছি না—তোমাদের কথা সবই তো আমি বুঝি।'

বিজয়া চুপি-চুপি বললেন, অন্তরঙ্গ স্বরে : 'ছাখ্, ছেলেটার মা নেই,

বাড়ির টান নেই—ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, বড় মায়া লাগতো। এত আদর-যত্নের প্রতিদানে তোর মনে এই বিষ ঢোকানো কি ওর উচিত হয়েছে? ভেবে ত্থাখ—তুই-ই বল্। যেটা অসম্ভব, যেটা কখনোই হবার নয়, সেটার মধ্যে তোর কাঁচা মনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া—ও যদি সত্যি ভালো হ'তো তাহ'লে কি এমন কাজ করতো? মায়ের শাসনে না-থাকলে ছেলেগুলো অমনি উচ্ছৃঙ্খলই হয় বুঝি!'

অরুণা কিছু বললে না; তার মুখ দেখেও কিছু বোঝা গেলো না।

তেমনি নরম সুরে, তেমনি ঘায়ে মলম লাগাবার ঢঙে বিজয়া বলতে লাগলেন: 'আমি বলি তোকে—এ নিয়ে তুই আর ভাবিসনে। এখন খুব কষ্ট লাগছে, কিন্তু এ-কষ্ট বেশিদিন থাকবে না—'

এবার অরুণা একটা মন্তব্য না-করে' পারলে না: 'কোন্ কষ্টই বা বেশিদিন থাকে, মা? ছেলে মরে' যায়—সে-কষ্টই কি মা-র মনে থাকে চিরকাল?'

ছেলে মরার প্রসঙ্গে একটু বিচলিত হ'য়েই বিজয়া বললেন: 'কী যে বলিস্ তুই, অরু, বুদ্ধি-সুদ্ধি সবই কি খুইয়েছিস্? অশোকের সঙ্গে কয়েকদিন দেখাশোনা না-হ'লেই, দেখবি, মনটা বেশ শান্ত হ'য়ে আসছে।'

এবারেও অরুণা জবাব না দিয়ে পারলে না: 'আমি যদি আজ নিরুদ্দেশ হ'য়ে হারিয়ে যাই তাহ'লে তুমিও তো প্রথম কয়েকদিন খুব কান্নাকাটি করবে—করবে না? আর তারপর সেটাই তো তোমার অভ্যেস হ'য়ে যাবে, সয়ে' যাবে—যাবে না? তারপর আবার তুমি হাসবে, আবার চাকরবাকরদের সঙ্গে খিটিমিটি করবে, আবার দুপুরবেলায়

খাওয়ার পরে মাসিকপত্র হাতে নিয়ে শোবে। সবই করবে। তাই বলে' কি এটা প্রমাণ হ'লো যে তুমি আমাকে ভালোবাসতে না ?'

এ-কথার কোনো জবাব খুঁজে না-পেয়ে বিজয়া পুরোনো সুরেই ফিরে গেলেন : 'আমার কথা শোন্, অরু, মনটাকে একটু স্থির কর্। তোর অমতে আর-কিছু হবে না। আমরা দেখে শুনে এমন জায়গাতেই তোর বিয়ে দেবো, যেখানে তোর মত হবে। ছাখ্, এমনিতে আমরা এখন নানা দুশ্চিন্তায় বিব্রত, তার উপর আর অশান্তি বাড়াস্‌নে। মন ভালো কর্ তুই—সবই ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনে। তোর বাবার উপর রাগ করে' কী করবি—তাঁর কি মাথার ঠিক আছে। জানিস্ তো তিনি রাগি মানুষ, একবার রাগ উঠলে না-বলতে পারেন এমন কথা নেই। তায় ছাখ্, এই ক'রাত একফোঁটা ঘুম নেই তাঁর চোখে। কী অশান্তি তাঁর মনে তা আমি তো জানি। প্রাণের চেয়ে তিনি ভালোবাসেন তোদের—আর তোরা কি তাঁকে এমন করে' কষ্ট দিবি ?' বিজয়ার চোখে করুণ মিনতি ফুটে উঠলো।

এটা অবৈধ, এটা হীন, অরুণার মনে হ'লো, মানুষের হৃদয়বৃত্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জেৎবার এই চেষ্টা। হীন এটা। কিন্তু অরুণা, তোমার আবার হৃদয়, আর তোমার আবার স্নেহ-মায়া—তুমি তো নষ্ট মেয়ে। তোমার বাবা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন। নষ্ট মেয়ে তুমি। তোমার হাতে ধরে' বলা হচ্ছে, তোমার বাবাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না : নিজে তুমি যত কষ্টই পাও—দু'দিনেই ভুলে' যাবে। তুমি সব সহ্য করবে, তুমি নিজের গলা টিপে ধ'রে শান্ত হবে ; আর-কেউ শান্ত হবে না, আর-কেউ কিছু সহ্য করবে না। তুমি যে নষ্ট মেয়ে।

অরুণা উঠে দাঁড়ালো।—'যাই, মা, স্নান করতে, বেলা হ'লো।'

বিজয়া একটু অবাক হ'য়েই তার মুখের দিকে তাকালেন। যেন সবে গানের আলাপ শেষ করে' এনেছি এমন সময় শ্রোতা 'বাঃ, বেশ বেশ' বলে' উঠে দাঁড়ালো।

'তাহ'লে তুই—কী ঠিক করলি ?' মেয়ের মুখ থেকে নির্দিষ্ট কিছু শোনবার আশা করলেন বিজয়া।

'আমরা কিছু ঠিক করবার কে, মা, অদৃষ্টই সব ঠিক করে।'

বলে' অরুণা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, মায়ের মুখের দিকে ভালো করে' একবার তাকালোও না। গেলো স্নানের ঘরে। অদৃষ্ট দিয়েছে ঠিক করে', এখন আর কোনো ভাবনা নেই। কাল। কাল সে যাবে। অশোক খবর পাঠিয়েছে সুমন্ত্রকে দিয়ে। সে যাবে। যাবে যাবে যাবে। কোনো ভাবনা আর নেই এখন। সে নষ্ট মেয়ে—তার আবার ভাবনা কী ?

ষোলো

অন্ধকার। অন্ধকার আর হাওয়া। হু-হু করে,' গুমগুম করে' ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। অন্ধকার গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেলো, রাত্রির বুক ভেঙে গেলো। খাঁচার মত ছোট একটি ইণ্টার-ক্লাশ কামরা চার-পাঁচজন যাত্রীর দখলে। জানলার ধারে অরুণা বসে', জানলায় হাত রেখে, বাইরের দিকে তাকিয়ে। নির্ঘুম উজ্জ্বলতা তার চোখে। তার পাশে অশোক ঘুমে ঢুলছে, থেকে-থেকে আধো জেগে উঠছে গাড়ির ঝাঁকুনিতে। অন্যান্য যাত্রীরা শোয়া-বসার বিভিন্ন অবস্থায় ঘুমে বিভোর। গাড়ির চীৎকার ছাড়া সমস্ত পৃথিবীতে আর-কিছু নেই।

একটু পরেই রেলের গর্জনের ঢেউ-তোলা রাত্রির সমুদ্রে একটা দ্বীপ দেখা গেলো। গাড়ি থামলো, ইষ্টিশান। আর সঙ্গে-সঙ্গে অশোক জেগে উঠলো অস্পষ্ট আধো-ঘুম থেকে, যেমন তন্দ্রার মধ্যে পড়ে' যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে-দেখতে হঠাৎ খাটে পায়ের ধাক্কা লেগে আমরা চমকে জেগে উঠি।

অরুণা মুখ ফিরিয়ে চুপি-চুপি বললে : 'রানাঘাট।'

'রানাঘাট!', অশোক পুনরুক্তি করলে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে।

পারিবারিক

'আর কত দূর ?'

'আর কী ? হ'য়ে এলো।'

'হ'য়ে এলো !' অরুণা হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠলো, যেন ভিতর থেকে একটা ঠাণ্ডা উঠলো লাফিয়ে।

'ও কী ?' অশোক সেটা লক্ষ্য করলে। 'কাঁপছো নাকি ?'

'না—না', হাসবার চেষ্টা করে' অরুণা বললে, 'ও কিছু না।'

জানলা দিয়ে মুখ বার করে' অরুণা প্ল্যাটফরমের দুই সীমান্ত দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ মাথা টেনে আনলো ভিতরে : কেমন অদ্ভুত পাংশু মুখে তাকালো অশোকের দিকে।

'কী হ'লো ?' রুদ্ধস্বরে বললে অশোক।

অরুণা মাথা-ঝাঁকুনি দিলে। তারপর দু' হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে পড়ে' রইলো হাঁটুতে মুখ থুবড়ে।

একটু পরে রেল-পুলিশের দু'জন কর্মচারী হেঁটে গেলো প্ল্যাটফরম দিয়ে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস পড়লো অশোকের। ঢোঁক গিলে ডাকলে, 'অরুণা !'

'উঁ ?'

'অরুণা, মুখ তোলো।'

'গেছে ?'

'ও কিছু না—শোনো।'

শ্বেত, পাংশু মুখ তুলে অরুণা নিবিড় চাপা গলায় বললে, 'পারবো তো ?'

পারিবারিক

'কী—কী পারবো ?'

'পারবো তো, পৌঁছতে ?' অরুণা নিজের মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে গেলো, তারপর মাথার দু'দিকের রগ দুটো টিপে ধরলো দু' আঙুলে।

'আর কী—এসে তো গেলাম', খুব সহজ, নির্ভাবনা হ'তে গিয়ে অশোকের গলা একটু কেঁপে গেলো। 'তোমার আবার মাথা ধরলো নাকি ?'

'ধরেছে একটু।'

'একটু তো ঘুমোলেও না !'

'ঘুম !' অরুণা বোকার মত একটু হী-হী করে' হেসে উঠলো।

'আমি যা-ই হোক্ মাঝে-মাঝে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি।'

অরুণা ফিসফিস করে' বললে : 'ঐ লোকটাকে খ্যাখো।'

'কোন্ ?'

অরুণা সেদিকে না-তাকিয়ে বললে : 'তোমার উল্টোদিকের বাঙ্কে—আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে !'

অশোক উদাসীনভাবে সমস্ত কামরাটা দেখে নিলে, সেই লোকটিকেও দেখলে।

'যাঃ !'

'চেনে নাকি আমাদের ?'

'কে জানে।'

'গাড়িটা ছাড়েই বা না কেন !'

নিজের চিন্তার অনুধাবন করে' অশোক বললে : 'চেনা হ'লেও

তোমাকে আমাকে একসঙ্গে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবে না। সে-ই ভরসা।'

আর-কেউ নামলো না, আর-কেউ উঠলো না, তবু গাড়িটা অকারণে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। এই শেষ দুটো ঘণ্টা বুঝি আর কাটে না। সমস্তটা পথ এমনি করে'ই তারা এসেছে—প্রতি অচেনা দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে, প্রতি কথায় চমকে, প্রতি শব্দে কেঁপে উঠে। এব্যারে শেষ হ'য়ে এলো পথ, ভোর হ'লো বলে'। ঈশ্বর, এই সময়টুকু আমাদের রক্ষা করো, আর একটু সময় বাঁচিয়ে রাখো আমাদের।

গাড়ি ছাড়লো। বাঙ্কের লোকটি মাঝখানে কনুইয়ে ভর দিয়ে আধো উঠে বসেছিলো, আবার লম্বা হ'য়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আবার অন্ধকার, আবার রাত্রির সমুদ্রে রেলের শব্দের ঢেউ।

জোরে হাওয়া লাগলো, সহজে নিঃশ্বাস পড়লো দু'জনেরই। এবার তারা একটু গলা খুলে কথা কইতে পারে, গাড়ির এত শব্দ। অশোক খুব সংক্ষেপে বললে: 'ভয় ?'

'উঁ ?'

'ভয় করে নাকি ?'

'না—না, ভয় নয়, ভয় নয়, তবে—' অরুণা ঢোঁক গিললো।

অশোক পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে' বললে: 'নাও।'

'কী ?—ও, চকোলেট।'

'খাও এটা। সমস্তটা রাস্তা কিছু তো খেলে না।'

'তুমিও তো খেলে না কিছু।'

'তুমি না-খেলে আমি খাই কেমন করে' ?'

পারিবারিক

'তোমার কি—খিদে পাচ্ছে ?'

'প্রচণ্ড। সিগ্যারেট খেতেও আর পারিনে।'

চকোলেটের রাঙতা ছাড়িয়ে আদ্ধেকটা ভেঙে অরুণা বললে, 'খাও।'

'হায়রে, আমার এই বিশাল জঠর-গহ্বরে তোমার ঐ একটুখানি চকোলেট কী করবে! তুমিই খাও, একজনের পেট ভরুক অন্তত।'

অরুণা হেসে বললে: 'তুমি কি বলতে চাও এর সমস্তটায় আমারই পেট ভরবে ?'

অশোক আস্তে পকেট চাপড়ে বললে: 'ভয় নেই—আরো আছে।'

'আরো! সমস্ত রাস্তা তো এই খেতে-খেতেই এলাম—পাহাড় নিয়ে এসেছিলে নাকি চকোলেটের।'

'এর নাম দূরদৃষ্টি—বুঝলে ? এরই জোরে মানুষ কৃতী হয়, জয়ী হয়, রাজা হয়—অনেক-কিছু হয়। রাজা হওয়ার রাস্তায় চলেছি, রাজোচিত গুণ অমনি কেমন বর্ত্তেছে, ত্যাখো।'

আর যে-ক'টা চকোলেট ছিলো, দু'জনে ভাগাভাগি করে' খেয়ে ফেললো। তারপর অরুণা বললে, 'ত্যাখো তো ঘড়িটা।'

'ঘড়ির দিকে যত ঘন-ঘনই তাকাও, সময়টাকে তো আর এগিয়ে দিতে পারবে না। নৈহাটি ব্যারাকপুর দমদম কলকাতা।' তারপর সেই স্বরেই বললে:

'হোটেল, খাওয়া স্নান, রেজিষ্ট্রারের আপিস, হোটেল, খাওয়া ঘুম বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, সে সব ব্যবস্থা করে' রেখেছে।'

'দাদাও শিগ্‌গিরই চলে' আসবে বললে।'

'ট্যুশানি করতে-করতে এম্-এ পাশ করবো, তুমি মাষ্টারি করতে-করতে বি-এ পর্য্যন্ত পাশ করবে।'

'কেন, এম্-এ পাশ করতে পারিনে ?'

'তা-ও তো বটে। বেশ তাহ'লে। তুমি ফষ্ট কেলাস এম্-এ হ'য়ে মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল হ'য়ে বসবে, আমাকে তখন তোমার পার্সনাল অ্যাসিসট্যাণ্ট্ করে' নিয়ো কিন্তু—পুরুষ বলে' অবজ্ঞা কোরো না।'

অরুণা হেসে উঠলো।

'একটা ভাবনা হচ্ছে। তোমার ঐ হোটেলে উঠে তো স্নান করবো, তখন—' অরুণা কথার মাঝখানে চুপ করে' গেলো।

কথাটা বুঝে নিয়ে অশোক বললে: 'ভয় নেই, আমার দূরদৃষ্টির আর-একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছি। আমার ঐ চামড়ার বাক্সটার তলায় গোটাকয়েক সাড়ি আত্মগোপন করে' আছে। বেশির ভাগ ঘরোয়া ধরণের মিলের, খানদুই বুঝি মুর্শিদাবাদ। তারই একখানা পরে' যাবে রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের সমীপে।'

'বাবাঃ!' অরুণা অবাক হ'য়ে বললে: 'এত জোগাড় করলে কোত্থেকে ?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে অশোক বললে: 'তুমি তো কিছুই আনোনি—না ?'

অরুণা মাথা নাড়লো।

'যাকৃগে—তাতে আর কী ? অন্য যে-সব বিচিত্র পরিধেয় তোমাদের মেয়েদের লাগে তার অগুনতি কিনে নিতে পাবে কলকাতায় আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

অরুণা একবার তাকালো, কিছু বললে না।

'ঘুম পাচ্ছে নাকি ?'

'না।'

'ঘুমোও না একটু। একটু শুতেও পারো ইচ্ছে করলে।'

অরুণা বললে, 'না।' তারপর জানলার উপর দু' হাত রেখে মাথা লুকোলো তার মধ্যে। হু-হু হাওয়া, গাড়ি চলেছে পুরোদমে অন্ধকারকে টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়ে। গাড়ি চলেছে, কলকাতা এলো বলে'।

* * * *

রেজিষ্ট্রারের আপিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে অশোক বললে: 'আর কী। এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন আর ভয় কী।'

উজ্জ্বল কালো চোখ তুলে তাকালো অরুণা। বেলা বারোটা, দুপুর। ঝলসানো-সাদা রোদে এই বৃহৎ ব্যস্ত সহর সমস্ত যানবাহন লোকজন বাড়িঘর নিয়ে অরুণার চোখে লাগলো অপরূপ এক সিনেমার ছবির মত। দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার, পরিপূর্ণ, অবিশ্বাস্য সুখে।

তাদের বিয়ের দলিলের কাগজটা বিজয়ী নিশানের মত উর্দ্ধে লাফিয়ে উঠলো, অশোকের হাতের মুঠোয়। অশোক বললে: 'এই নাও— পৃথিবী!'

অরুণা বললে: 'কাগজখানা সাবধানে পকেটে রেখে যাও—হারিয়ে ফেলো না আবার।'

উচ্ছ্বসিত, অসম্বরণীয় খুসিতে অশোক বলতে লাগলো: 'এখন আমরা কোনদিকে যাই—কোথায় যাই বলো। সমস্ত পৃথিবী এখন আমাদের,

আমাদের—সমস্ত সময়। এখন আমরা হাওয়ার মত, এখন আমরা জলের স্রোতের মত। কেউ আমাদের বাঁধতে পারে না।' তারপর, একটু চুপ করে' থেকে :

'চলো হোটেলেই ফিরি। লম্বা ঘুমে লম্বা দিন শেষ হোক্।'

একটা ট্যাক্সি ডেকে তারা উঠে পড়লো। অরুণা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলো গাড়িটাকে—কিনলে ফুলের তোড়া, কিনলে ফুলের মালা, কিনলে ধূপকাঠি, অশোক কিনলে সন্দেশ আর সিগারেট।

আর হোটেলের ছোট ঘরে গিয়ে দিলে দরজা বন্ধ করে'; দরজা বন্ধ করে' দিলে সমস্ত পৃথিবীর মুখের উপর। অরুণার পরনে একখানা চাঁপা রঙের রেশমি সাড়ি, কুচকুচে কালো পাড় তোলা—অশোক এখানা চুরি করেছিলো তার বোনের বাক্স থেকে। অরুণা খুলে দিলে চুল, হোটেলের চায়ের পিরিচে রাখলো মালা, হোটেলের জল খাবার গেলাসে বসালো তোড়াগুলো। ঘরের কোণে জ্বাললে ধূপকাঠি। একটু পরে ঘরের হাওয়া নিবিড় হ'য়ে উঠলো ফুলের গন্ধে আর ধূপের গন্ধে।

অশোক সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলো, অরুণা বললে : 'ওটা এখন থাক্, এখানে এসো একটু।'

অশোক দেশলাইটা দু' আঙুলে আলগোছে ধরে' অরুণার দিকে তাকালো।

'এসো এখানে', অরুণা বললে। 'এসো তোমাকে একবার প্রণাম করি।'

আর তারপর, হোটেলের সরু খাটে অশোকের পাশে বসে', হঠাৎ থর্থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো অরুণা, থর্থর্ করে', যেমন করে' কচি পাতায়

পারিবারিক

গাছ্ কেঁপে ওঠে ঝড়ের মুখে, তারপর তার কান্না ঝর্‌ঝর্ ক'রে, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে প'ড়ে' ঝর্‌ঝর্ ক'রে' কাঁদতে লাগলো সে, কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলো 'মা, মাগো, মা—বাবা, বাবা!' কাঁদতে লাগলো, আর কাঁপতে লাগলো, আর অশোক ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে, ভুলে' গেলো সিগারেট ধরাতে।

সতেরো

'কাল আমরা রেজিষ্ট্রি করে' বিয়ে করেছি, আছি ভালো। আমাদের জন্য কোনোরকম চিন্তাই কোরো না।

অরুণা।'

হৃষীকেশবাবু আপিস-ঘরে বসে' চিঠিটা পড়লেন। এক লাইনের চিঠি, তবু সেটুকু পড়তে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর যেন অনেকক্ষণ লাগলো। বিজয়া পড়ে' আছেন শোকশয্যায়, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে'। তাঁকে চিঠিটা দেখাতে হবে। কোনোরকম চিন্তাই করতে হবে না, কোনোরকম চিন্তারই দরকার নেই। এই কোনোরকম কথাটাই ভয়ানক।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হৃষীকেশবাবু উঠে এলেন। উপরে ওঠবার সিঁড়ির কাছে বারান্দায় সুমন্ত্র। থমকে দাঁড়ালেন তাকে দেখে।

'ভাখো', হৃষীকেশবাবু চিঠিটা সুমন্ত্রর হাতে দিলেন।

কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই সুমন্ত্র সেটা ফিরিয়ে দিলে।—'যাক, বিয়ে হ'য়ে গেছে তাহলে', নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মুহূর্তে হৃষীকেশবাবু যেন পাথরের মূর্তি হ'য়ে গেলেন, চোখের পলক

পড়ে না। অনেকক্ষণ পর খুব, খুব নিচ গলায় বললেন : 'মন্তু, তুমি জানতে ?'

'জানতুম', কথাটা বলেই সুমন্ত্র বারান্দা পার হ'য়ে চলে' গেলো তার নিজের ঘরে।

বারান্দায় বাইরের লোকের বসবার জন্য একটা কাঠের বেঞ্চি, হৃষীকেশবাবু সেইখানেই বসে' পড়লেন। চেষ্টা করলেন অন্য কথা ভাবতে। বিকেল হ'লো। এ-সময়টায় বাড়ির সামনেকার উঠোন পাড়ার ছেলেদের কলরবে ভরে' ওঠে রোজ। আজ একেবারে ফাঁকা। তিনি বারণ করে' দিয়েছেন। পিণ্ট গেছে পাশের বাড়িতে খেলতে— না কি আর কোথাও গেছে কে জানে! যে চড়কিবাজি শিখেছে ছেলেটা।

চুপ করে' বসে' রইলেন হৃষীকেশবাবু, হাতের মুঠোয় অরুণার চিঠিটা শিথিলভাবে ধরা, কেন উঠে এসেছিলেন কোথায় যাচ্ছিলেন ভুলে' গেছেন যেন। উঠোনে লম্বা হ'য়ে ছায়া পড়লো, আর সেই ছায়ারই মত নিঃশব্দে টুনকি যে কখন্ এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছে তিনি টেরও পাননি। টুনকি এক পাশ থেকে তাকিয়ে আছে তার বাবার মুখের দিকে বড়-বড় ভীরু চোখ মেলে, নিঃশব্দে।

হঠাৎ কিসের একটু শব্দ হ'লো, হৃষীকেশবাবু অস্বাভাবিকরকম চমকে উঠলেন।—'কে- কে ওখানে ?' বলতে গিয়ে তাঁর গলা প্রায় ভেঙে গেলো।

টুনকি দরজার আড়াল থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এলো।

'ও, টুনকি !' মস্ত একটা নিঃশ্বাস পড়লো হৃষীকেশবাবুর। 'কী রে টুনকি, কী চাই ?'

পারিবারিক

টুনকি বাবার কোল ঘেঁসে দাঁড়ালো, কিছু বললে না।

মেয়েটার ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল বুলোতে-বুলোতে হৃষীকেশ-বাবু ডাকলেন : 'টুনকি।'

'বাবা!' একটু পরে টুনকি আবার ডাকলে, 'বাবা!' আর-কিছু বললে না।

হৃষীকেশবাবু বললেন : 'কী করছিস রে তুই একা-একা? যা, মীরার সঙ্গে খেলা কর্‌গে।'

টুনকি অনেক্ষণ চুপ করে' রইলো, তারপর হঠাৎ বললে :

'বাবা, তুমি রাগ কোরো না। দিদি খুব ভালো, দিদি খুব ভালো।'

সঙ্গে-সঙ্গে টুনকিকে নিবিড় করে' বুকে চেপে ধরলেন হৃষীকেশবাবু। বোবা গলায় বলে' উঠলেন : 'আমি রাগি মানুষ তা তো সে জানে। সে তো জানে—তবু আমার উপর রাগ করলে কেন?'

আঠারো

'দি পাইন্‌স্‌, শিলঙ

১ জুন

'প্রীতিভাজনেষু,

কাল থেকে এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে কী বলবো! চেরাপুঞ্জির পুঞ্জীভূত মেঘ দস্যু তাতারের মত পড়েছে এসে আমাদের ঘাড়ে। মা বলছেন: 'কোন্‌ সুখে যে মানুষ এ-সব দেশে আসে! যদি জামা-কাপড়ের বস্তা হ'য়েই দিন কাটাতে হ'লো, তাহ'লে আর বেঁচে সুখ কী!' তাঁর গায়ে একটি ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট চড়েছে, সেটা হ'লো গিয়ে বস্তা। সেকেলে ছাঁটের জামা, পুরো হাতা, দেখতে অদ্ভুত—কিন্তু দেখতে মন্দ নয়। কলকাতার পাথার হাওয়ায় হালকা জামা-কাপড়েই মা থাকেন ভালো, উপরন্তু কিছু হ'লেই তাঁর উৎপাত মনে হয়। আবার কোনো-কোনো লোক দেখেছি, জামা-কাপড় পরতে পারবে ব'লেই তারা পাহাড়ে আসে। আমাদের অমৃত সরকারকে নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি। এ-পোড়া দেশে কাপড়চোপড় প'রেও কি ছাই সুখ আছে! সর্বদাই এ-আপশোষ তাঁর মুখে। কিছুকাল ইয়োরোপের জলবায়ু সেবন ক'রে

এসেছেন, বাক্স বোঝাই বণ্ড্ স্ট্রিটের পোষাক, ল্যাব্রাডর কোট সীলস্কিন টুপিও নাকি বাদ পড়েনি। ভদ্রলোকের দুঃখের কথা একবার ভাবুন! এত ভালো-ভালো পোষাক—বছরে একটি দিন বা'র করতে পারেন না। দয়া হয় না!

বাবা শালমুড়ি দিয়ে ম্যান অ্যাণ্ড দি ইউনিভর্স নামে এক বিরাট বই পড়ছেন। একফাঁকে আমি ও-বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেখেছি: আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, এক বর্ণও বুঝিনি। বইয়ের এ-রকম নাম শুনলেই আমি যেন অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করি। নিতান্ত অজ্ঞ আমি, নিতান্ত মূর্খ: মানুষের জীবনের এই যে বিরাট একখানা কাণ্ড এতকাল ধ'রে চ'লে আসছে, সেটা তলিয়ে দেখবার কৌতূহল কখনোই হয় না। নিজের জীবনটাকে প্রতি মুহূর্ত্তে এত বেশি ভালো লাগে যে তার বাইরে—কি তার আড়ালে—কী আছে না আছে সেটা মনেই হয় না কখনো। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, এ-সব জেনে কী হয়? এ কি আমাদের বেশি সুখী হ'তে সাহায্য করে? তা ছাড়া, এই জানবারই বা নিশ্চয়তা কী? দেখতেই তো পাচ্ছেন, ঘন-ঘন সব বদলাচ্ছে: তবু মানুষ যে-যুগে বাস করছে, সে- যুগের সমস্তই ধারণাই অভ্রান্ত সত্য ব'লে অনায়াসে মেনে নিচ্ছে।

যাকৃগে, সম্প্রতি আমার খুব বেশি ভালোও লাগছে না। বর্ষাতি চড়িয়ে পাইন-সুগন্ধি পথে-পথে ঘোরা, একা ব'সে-ব'সে পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাওয়া—বড় জোর টপ্সির সঙ্গে একটু খেলা, এ ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পাইনে। মাঝে-মাঝে একটা কী চাই কী চাই বচন না পাই মন-কেমন-রে গোছের ভাবে এই বৃষ্টি-ঝরা দিন উন্মন হ'য়ে ওঠে।

পারিবারিক

এখানে আমরা এসেছি আজ মন্দ দিন হ'লো না, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আমার একজনও 'বন্ধু'' হয়নি। আপনি তো বলেন মেয়েতে-মেয়েতে বন্ধুতা হবার পক্ষে রেলগাড়ির এক কামরায় এক ঘণ্টাই যথেষ্ট: মেয়েদের অন্তর সম্বন্ধে এমনি অনেক অসাধারণ খবর আপনার কাছ থেকে মাঝে-মাঝেই পাওয়া গেছে। এখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'লে না হয় পুরুষদের অন্তরের রহস্য এম্‌নি উদ্‌ঘাটন ক'রে সময় কাটানো যেতো: তারপর আমাদের অনুসন্ধানের ফলগুলি একটি সুনিপুণ পার্সেলে পাঠিয়ে দিতুম আপনার কাছে—আপনার পুরুষ-বক্ষের কোনোখানে এতটুকু আঁচড়ও লাগতো না, এ-কথা দয়া ক'রে বলবেন না।

বাজে ব'কে যাচ্ছি। কিন্তু বৃষ্টিতে বন্ধ ঘরে একা ব'সে-ব'সে বাজে না-ব'কে উপায় কী? একটা বই পর্য্যন্ত নেই যে পড়ি। সেবারে রাঁচি যাবার সময় বাক্স বোঝাই ক'রে বই নিয়ে গিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম এই নির্জন অবসরে প্রাণ ভ'রে প'ড়ে নেবো। দু'মাস পরে কলকাতায় যখন ফিরে এলাম তখন রবিঠাকুরের 'যাত্রী'র সাড়ে তিন পৃষ্ঠা আর ভার্জিনিয়া উল্‌ফের এক নভেলের প্রথম কয়েক লাইন পড়েছি। সেই শিক্ষার উপর নির্ভর ক'রে এবারে কোনো বই-ই আনিনি—এখন দেখছেন তো অবস্থাটা। 'অভিজ্ঞতা'য় মানুষের কোনো শিক্ষাই হয় না, এই একটা শিক্ষা আমার হ'লো। প্রতিবারের অভিজ্ঞতাই নতুন।

আচ্ছা, বলতে পারেন কেন মানুষের সময় কাটে না? সময় কাটে না ব'লেই তো এত বই, গ্রামোফোন আর রেডিয়ো, ফুটবল আর সিনেমা। কেন সময় কাটে না বলতে পারেন?

মায়া।

'পুনশ্চ—শেষের প্রশ্নটা'র জবাব প্রত্যাশা করি না ; তা ছাড়া, আপনি তো আজকাল চিঠিপত্র লেখা ছেড়েই দিয়েছেন।'

'—লারমিনি ষ্ট্রিট
উয়ারি, ঢাকা
৪ জুন

প্রীতিভাজনাসু,

আপনার ওখানে মন-কেমন-করা মেঘ্‌লা দিন, আর এখানে···। খুব কবিত্ব ক'রে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, সামলে গেলুম। আপনার আগের চিঠির জবাব লিখিনি ; তবু যে আপনি আরো একখানা চিঠি লিখেছেন সেটা আপনার দয়া ছাড়া কিছু নয়। অবিশ্যি জবাব লেখা বললে ঠিক কথাটা বলা হয় না। ব্যবসায়িক চিঠির অবিলম্ব জবাব আসার নিয়ম: সেখানে জিজ্ঞাসা আছে, সুতরাং তার উত্তরও আছে। কিন্তু আপনার আমার এ-চিঠিগুলো অবসরের বিস্তৃত জলে ছোট-ছোট ঢেউ, খেয়ালের হাওয়া-লাগা, এক-একটা ঝোঁকের ধাক্কায় ওঠে ছল্‌ছলিয়ে। সত্যি বলতে, ক'দিন ধ'রে সেই ঝোঁকটা ছিলো না আমার মনে ; সারাদিন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আর পবিত্র পৈতৃক উপদেশ শুনে-শুনে কী-রকম ম'রে ছিলাম যেন। সে-অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে বসলে লেখা হ'তো, কিন্তু চিঠি হ'তো না। আমার অবস্থা বুঝে আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।

স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কখনো যদি কিছু মন্তব্য ক'রে থাকি, আমার সে-ঔদ্ধত্য আপনার বিদ্রূপ-বাণে খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে গেছে। বলতে দোষ নেই,

পারিবারিক

এ-বিষয়ে আমি নিতান্তই অর্বাচীন; আমার সমস্ত মতামত (শুনতে যতই গম্ভীর ও 'অভিজ্ঞ' হোক্) নভেল ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত। আর নভেল পড়া বিষয়েও আপনার সমকক্ষ কোনোকালে আমি হ'তে পারবো না। আপনার মুখে নানা দেশের নানা বইয়ের নাম যখন শুনি, খুব একটা সহজ স্বচ্ছন্দ হাসির আড়ালে নিজের অযোগ্যতা চাপা দেবারই চেষ্টা করি। ব্যর্থ চেষ্টা, বলাই বাহুল্য। আমার চোখের সামনে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী আপনি থাকতেও আমি করবো মেয়েদের নিয়ে মন্তব্য! ক্ষেপেছেন!

কিন্তু সম্প্রতি আর-একটি মেয়ের হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে। (আর-একটি বললুম: তার মানে এ নয় যে আপনার হৃদয়ের রহস্য আমি কিছু জানি। সত্যি বলুন তো—আপনি নভেল পড়তে ভালোবাসেন আর টপ্‌সিকে ভালোবাসেন, আর সুন্দর চিঠি লেখেন, এ ছাড়া আর কিছু কি জানি আপনার সম্বন্ধে?) কিন্তু যে-মেয়েটির কথা বলছি, তাকে বুঝতে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিও লাগে না, তার বর্ত্তমান অবস্থা একেবারেই স্বপ্রকাশ। আমার মা-বাবার মত যারা ইচ্ছে ক'রে অন্ধ নয়, তারা দেখেই বুঝতে পারে। এ-ব্যাপারটা আমার পক্ষে ফাস্ট্ হ্যাণ্ড্ এক্সপিরিয়ন্স, কোনো বইয়ে পড়া ঘটনা নয়, সুতরাং এটা নিয়ে কিঞ্চিৎ গর্ব বোধ না-ক'রে পারছি না। এর পরে বন্ধুমহলে প্রণয়-তত্ত্ব নিয়ে কোনো তর্ক উঠলে এই প্রত্যক্ষদর্শনের জোরে অথরিটি সেজে কিছু বলতে পারবো এমন ভরসা রাখি।

তাহ'লে সমস্তটাই বলি। মেয়েটি আর-কেউ নয়, আমার বোন। নাম তার অরুণা, তার কথা এ-যাবৎ আপনাকে কেন যে লিখিনি জানিনে। খুব ভালো মেয়ে সে, আমার বড় ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে

তার আলাপ হোক্। কোনোদিন হবে হয়তো। আর একটি মানুষের পরিচয় দিতে হচ্ছে, সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু অশোক সেন। এখন অরুণা আর অশোক—এ-পর্য্যন্ত কেমন লাগছে ?

যেমন চৈত্রমাসে থেকে-থেকে দক্ষিণে হাওয়া বয়, তেমনি এই দু'জনের রোমান্সের হাওয়া ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগাচ্ছে আমাকে। এরা দু'জন রচনা করেছে যে-স্বতন্ত্র রহস্যলোক আমি সেটা টের পাচ্ছি আভাসে ইঙ্গিতে হঠাৎ সুগন্ধে। এটা কেমন ? যেমন কিনা পাশের ঘরে ব'সে একজন সেলাইয়ের কল চালাচ্ছে আর গুন্‌গুন্ গান করছে ; কলের শব্দ কখনো ছাপিয়ে উঠছে গানকে, কখনো গানের নিচে কলের শব্দ পড়ছে চাপা ; আবার কখনো কল আর গান দুই-ই থেমে যাচ্ছে একসঙ্গে, সেই বিরতির ফাঁকে-ফাঁকে শোনা যাচ্ছে চুড়ির টুংটাং : হঠাৎ হাওয়ায় মাঝখানকার পরদাটা একটু উঠে গেলো, দেখতে পেলুম বড় জোর কালো পাড়ের ক্ষণিক বাঁকা রেখা। এই ঘন রহস্যের মধুর ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে : ভালোই লাগছে। এরা আমাকে এড়িয়ে চলে ; হয়তো ভয়ও করে মনে-মনে, কিন্তু আমি যে বুঝেছি তাও এদের বুঝতে বাকি নেই। চিরকুমার সভার বুড়ো রসিকের পার্টটা বড় মজার ; ও-রকম কাউকে পেলে প্রণয়ীরা বেঁচে যায়। কিন্তু আমাকে ও-পার্ট বুঝি এ-পর্য্যন্ত ঠিক মানায় না, তাই আমাকে নিঃশব্দ উদাসীনতার ভাব ধ'রেই থাকতে হচ্ছে। নিজে কোনোভাবে লিপ্ত না-থেকে বাইরে থেকে প্রণয়-কাহিনী অনুসরণ করা ব্যাপারটা মন্দ না। এখানকার নির্জীব স্তিমিত দিনগুলিতে তবু একটু বৈচিত্র্য এলো।

ব্যাপারটাকে এখনো খুব লঘুভাবেই দেখছি ; কিন্তু মনে-মনে আমার

ভয় আছে যে শিগগিরই এটা মারাত্মক কিছু হ'য়ে উঠবে। অশোক সেনের সঙ্গে আমার বোনের জাতে মেলে না : এদিকে আমার মা-বাবা··· এ-বিষয়ে তাঁদের মনের ভাব তো বুঝতেই পারেন। প্রাণ থাকতে না— এই হবে তাঁদের কথা। আর আশ্চর্য্য এই যে তাঁরা যেটাকে অবৈধ মনে করেন, এক অতি সুখকর অন্ধ আত্ম-বিশ্বাসে সেটাকে অসম্ভবও মনে করেন। পাগল, এ কি কখনো হ'তে পারে! আমার যেটা মত নয়, পৃথিবীতে সেটা ঘটতেই পারে না—কী চমৎকার পরিতৃপ্ত জীবনদর্শন, ভাবুন তো! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কী দুঃখের, কী নিদারুণ দুঃখের। সেই নিশ্চিন্ত আত্ম-বিশ্বাসে যখন আঘাত লাগে, সে কি ভেঙে চুরমার ক'রে দেয় না!

আমার মা-বাবা যদি এমন ঘোরতর আত্ম-কেন্দ্রিক, আত্ম-তৃপ্ত না-হ'তেন তাহ'লে তাঁরা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে যাঁরা অন্ধ, তাঁদের নিয়ে কী হবে বলুন! একদিন তো চোখ খুলতেই হবে, তখন একাধারে অশ্রু-বন্যা আর রোষ-বিস্ফোরণেও কিছু ফল হবে কিনা ভাবছি। আবার এ-ও ভাবছি : অরুণা কি অতটা সইতে পারবে? শেষ পর্য্যন্ত এদেরই হয়তো হার হবে···ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মোট কথা, যে-ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ খুবই আসন্ন দেখতে পাচ্ছি, তার যে কী ফল হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে দারুণ দুঃখ ভেঙে পড়বে সকলেরই মাথায়—হয়তো মা-বাবার উপরেই সব চেয়ে বেশি।

যাক্‌গে এ-সব, এবারে আপনার কথা কিছু বলুন, খুব বেশি ক'রেই বলুন।

'সুমন্ত্র'

উনিশ

বৃষ্টি-কেটে-যাওয়া রোদে-ঝল্‌সানো বাগানে ব'সে মায়া পড়লো এই চিঠি। 'আর-একটি মেয়ের হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে…' মায়া ভুরু কুঁচকোলো, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। কে—কে সেই মেয়ে ? সে কি খুব সুন্দর দেখতে ? কিন্তু সে-বিষয়ে সুমন্ত্র কিছু লেখেনি। মায়া প'ড়ে গেলো—তারপর ছাড়লো গভীর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। ও, বোন। ওর বোন, তাই বলো! মায়া তাকিয়ে দেখলো একটু দূরে টপ্‌সি একটা ন্যাকড়ার বল্ নিয়ে খেলা করছে। তার দিকে চোখ পড়তেই হা-হা ক'রে কাছে ছুটে এলো। তার আদরের আতিশয্যে অস্থির হ'য়ে উঠলো মায়া। ছোট্ট একটা চড় মেরে বললে : 'যাঃ, ভাগ্।'

টপ্‌সি মায়ার হাতের চিঠিখানা আস্তে কামড়ে ধরলো। ভাবখানা এই—ও-সব থাক্ এখন, এসো আমার সঙ্গে খেলবে।

মায়া তেড়ে উঠলো : 'চিঠিটা খেতে এলি কোন্ সাহসে বল্ তো! আর কারো কথা তো লেখেনি—ওর বোন যে!'

তারপর চিঠিখানা আগাগোড়া আর-একবার পড়লো। ব্যাপারটা বেশ ঘনিয়ে আসছে ব'লেই তো মনে হয়। সুমন্ত্রর মা-বাবা দেবে না

বুঝি আলাদা জাতে বিয়ে। তার মা-বাবা কী করতেন? জানে না সে। এ-সব কথা কি জোর ক'রে কেউ বলতে পারে! কার মনে কী আছে কে জানে। মা যা-ই করুন, বাবার নিশ্চয়ই ও-সব কথা কিছু মনেই হ'তো না। মুহূর্ত্তের জন্য, নিজেকে ঐরকম একটা সঙ্কটে কল্পনা ক'রে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। অত সাহস তার কি হবে? অত দুঃখ পারবে কি সইতে?...

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মায়া খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো, কী ভাবছে নিজেই জানে না। ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে পাইনের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে, মেঘ কেটে গিয়ে কী আশ্চর্য্য নীল আজকের আকাশ। আর চারদিকের অসহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মায়ার বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'লো নিজেকে, তেমন আর কখনো হয়নি। কে যেন তাকে কোন্ কথা দিয়ে ভুলে গেছে; কখন্ যেন কার আসবার কথা ছিলো, আসেনি। কত পাহাড়ের বাঁকা রেখা দিগন্তে, এখানে পথে-পথে কত ঝরনার উচ্ছলতা, আকাশে কত উজ্জ্বল আলো-ছায়ার খেলা চলেছে দিনে-রাত্রে —তবু...তবু। কী যেন নেই, কী যেন নেই।

একটু পরে মায়া মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছোট্ট শালটা গায়ের উপর টেনে নিয়ে উজ্জ্বল উদ্ধত ফুলের সারির ভিতর দিয়ে চললো বাড়ির ভিতরে। টপ্‌সি তাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে পিছনে দৌড় ন্যাকড়ার বল্ ফেলে। স্বামিনী ঘরে ঢোকবার আগেই সে ঢুকেছে, দখল ক'রে নিয়েছে টেবিলের তলায় কম্বলের উপর তার নিজের জায়গা। আড়মোড়া ভেঙে গোল হ'য়ে শুয়ে পড়লো টপ্‌সি, আর তার চোখা নাকটার দু' ইঞ্চির মধ্যে জুতোর ডগা রেখে মায়া টেবিলে ব'সে সুরু করলো চিঠি লেখা।

পারিবারিক

'আপনার এবারের চিঠি প'ড়ে আমার মনটা কেমন যে হ'য়ে গেছে কী ক'রে বলি। আপনাকে ঘিরে এখন যে-রহস্য, এত দূর থেকে আমাকেও তা হানা দিচ্ছে যেন। আপনার বোন অরুণাকে চিনি না, কিন্তু মনে হয় তাকে যেন চিরকাল চিনি। এমনি সর্ব্বনেশে সঙ্কটের মুখে কত হৃদয় ঝড়ের পাখির মত পথ হারিয়েছে তা তো ইতিহাসে পড়েছি, উপন্যাসে পড়েছি। কেউ তারা ছিঁড়ে গেছে, হেরে গেছে; কেউ বা হয়েছে জয়ী। গল্প হিসেবে দুটোই সমান সার্থক, কিন্তু সত্যিকারের জীবনে এ-দুইয়ে কত প্রভেদ, কী ভয়ঙ্কর প্রভেদ। বুক-ভাঙা ট্র্যাজিডির গল্প বানানো এক কথা, আর নিজের জীবনে সেটা প্রত্যক্ষ করা···ভাবতে পারিনে। আমার কেবল এই কথাই বার-বার মনে হয়: কেন হয় এমন? সবই নিজের মরজি-মত চলবে, এমন আশা করা অন্যায় আবদার তাও বুঝি—তবু এ-কথা মনে না-ক'রে পারিনে যত সব ট্র্যাজিডি ঘটে সেগুলো সবই প্রায় একেবারে অকারণ—ইচ্ছে করলেই অনায়াসে এড়িয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু ইচ্ছেটা কে করবে? এ-পক্ষ দোষ দেবে ওকে, উভয় পক্ষেরই কিছু বলবার থাকবে নিশ্চয়ই: কিন্তু সত্যি-সত্যি কে যে দোষী কে তার বিচার করবে?

'বড় সুন্দর রোদ উঠেছে আজ সকালবেলায়; কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে এর পিছনে যেন চিরকালের একটি কান্না প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেন একটা তীব্র বাসনা কেঁদে-কেঁদে ফিরছে, তা বুঝি পূর্ণ হবে না কখনো। মানুষের জীবনে কত যে অপূর্ণতা, কত যে ব্যর্থতার

ভগ্নস্তূপ! তবু: জীবনের সব চেয়ে বড় সার্থকতার উৎস যেখানে সেটা শুকিয়ে না যায় তাহ'লে অন্য সমস্তই কি সহ্য করা যায় না? সেখানে বঞ্চিত করা আর অন্নাভাবে হত্যা করা একই কথা।

'আমার এই অসংলগ্ন বিস্রস্ত কথাগুলি মার্জনা করবেন: হয়তো নির্বোধের মত, হয়তো ছেলেমানুষের মত আমি ভাবছি, দুঃখ না-দেয়াটা এখন এত সহজ তখন কেন মানুষ দুঃখ দেয় আর সেই সঙ্গে নিজেও দুঃখ পায়। এক-এক সময় আমার মনে হয় আমরা যেন প্রতিজ্ঞাই করেছি পরস্পরকে সুখী হ'তে দেবো না। আমি তো খুব সুখী; সত্যি কথা বলবো এ-পর্য্যন্ত আমার জীবনে কোনো দুঃখেরই ছায়া পড়েনি; আমার ইচ্ছে করে সকলেই আমারই মত সুখী হোক্—কেন মানুষ মুখ ম্লান করবে, কেন মানুষ কাঁদবে—কাউকে ভয় করবার কি দয়া করবার প্রয়োজন কেন থাকবেই? আমি জানি পৃথিবীর কত জ্ঞানী গুণী কত শ্রেষ্ঠ মানুষ এ-বিষয়ে চিন্তা ক'রে কোনো কূল পাচ্ছেন না; তাঁদের কথা আমি বুঝি না, কিন্তু বাধ্য হ'য়েই এটা বুঝতে হয় যে সমস্যাটা সহজ নয়। কেননা সহজ যদি হ'তো তাহ'লে এতদিনে এটা আর সমস্যাই থাকতো না। অন্য সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের কথাই তখন মনে হয়। যদি কোনোদিন আমার জীবনেও এমনি কঠিন কোনো দুঃখ আসে…

'আপনার বোধ হয় মনে হচ্ছে আমি ভীরু, আমি দুর্বল। সত্যি ভীরু আমি। দুঃখে মোটে অভ্যস্ত নই ব'লে দুঃখ সম্বন্ধে আমার দারুণ ভয়। আপনার বোনের কথা বার-বার মনে পড়ছে। যদি কোনোদিন ঠিক সময়টি আসে, তাকে জানাবেন, দূর থেকে তার এক নিঃশব্দ বন্ধু তার

দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে; তার হাতের উপর হাত রেখে সে এই কথাই জানতে চায় যে কোনো ভয় নেই।

'মায়া।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুমন্ত্র দ্বিতীয়বার এ-চিঠি পড়লো, তারপর অনেক রাত পর্য্যন্ত তার ঘুম এলো না। একটি নতুন মানুষ হঠাৎ দেখা দিয়েছে তার চোখের সামনে: নাম তার মায়া। যে-মায়াকে সে কলকাতায় চিনেছে, যে-মায়ার সঙ্গে এ-ক'দিন তার পত্রব্যবহার, এ-চিঠি যেন তার লেখা নয়। নাগরিক বক্রোক্তি বিনিময়ের সরস পরিহাসের ভিতর থেকে হঠাৎ এ কে বেরিয়ে এলো! অস্বস্তির মত লাগলো সুমন্ত্রর: কিন্তু অতি মধুর অস্বস্তি, এই ঘুম না-আসা যেন কোনো অদ্ভুত নেশার মত। কী লিখবে সুমন্ত্র এ-চিঠির উত্তরে? তার কি সাহস আছে? তার কি সাহস আছে? কিছু সে ভাবলে না, মনে-মনে কোনো কথা সাজাবার চেষ্টা করলে না, আলো-নেবানো ঘরের নিঃশব্দ রাত্রির মধ্যে নিঃস্পন্দ হ'য়ে রইলো। আর আস্তে-আস্তে সে যেন অনুভব করলে ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট উপস্থিতি: শুক্লপক্ষের চাঁদ কখন্ আকাশে উঠে এসেছে, জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে না, কিন্তু মশারির ফাঁক দিয়ে জ্যোছনার আভা এসে পড়েছে বিছানায়। সে জানেনি, সে টের পায়নি, চাঁদ কখন্ উঠে এসেছে আকাশে, চাঁদ কখন্ এসে ঢুকেছে তার ঘরের মধ্যে।

কুড়ি

'—লারমিনি ষ্ট্রিট
উয়ারি, ঢাকা
৮ই জুন, রাত্রি

'কালই আপনাকে চিঠি লিখতুম, কিন্তু কাল একটা কাণ্ডই হ'য়ে গেলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঝড় সুরু হ'য়ে গেছে। প্রথম ঝাপটটা বেশ জোরেই আসে, চমকও লাগায় বেশি—মনে হয় নিলে বুঝি সব উড়িয়ে। কিন্তু সেটা সামলে উঠতে পারলে তত ভয়ঙ্কর আর মনে হয় না।

প্রথমে একটু ভূমিকা করি। আমার বাবা হচ্ছেন ঘোরতর ইগোয়িস্ট্ ধরণের মানুষ: তিনি যা করেছেন তিনি যা বুঝেছেন তাঁর জীবনে যেটা ঘটেছে আমাদের মত সত্তাহীন জীবের পক্ষে সেটাই হচ্ছে মডেল। কোথাও তার কোনো ব্যতিক্রম দেখলে তিনি ক্ষেপে যান; তুচ্ছতম থেকে গুরুতম বিষয়ে অতি উচ্চস্বরে নিজের মত জাহির করা ও অন্যের উপর স্থূল জবরদস্তি করা—তাঁর পৌরুষের ধারণা হচ্ছে এই। অথচ তিনি কৃপণ নন, কঠিন নন, কোনোরকম হীনতা তাঁর মধ্যে নেই। যদি

তিনি নিজের বাইরে এসে কখনো দেখতে পেতেন—কিন্তু যা হবার নয় তা নিয়ে আপশোষ ক'রে লাভ কী? আমার মা নিতান্ত ভালোমানুষ, একসঙ্গে সবাইকে খুসি করবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই হাঁপাচ্ছেন, তাঁর অত্যধিক স্নেহ প্রায়ই অত্যাচার হ'য়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুতরকমের স্নেহ—শরীরের তুচ্ছতম সুখের জন্য কত পরিশ্রম, কিন্তু মনের দিকে একেবারে তাকাতেই অক্ষম। মা-র হয়তো ধারণা শরীরটা সুখে থাকলেই মানুষ সুখে থাকে: খাবার সময় অকারণে বেশি-বেশি পাতে ফেলে দেয়া (ভুলের ভাণ ক'রে) আর রাত্রে অতি সযত্নে হাওয়া ক'রে মশারির চারদিক গুঁজে দেয়া—এখানেই কি ভালোবাসার সীমা?

অরুণার কথা তো আগেই বলেছি, কোনো হিসেবেই সে অসাধারণ নয়, কিন্তু ঘটনার চাপে সে অসাধারণ হ'য়ে উঠছে। অসাধারণ তাকে হ'তেই হবে, নয়তো সে বাঁচবে না। এখন হয়েছে কী, মা-বাবা তো একজায়গায় অরুণার বিয়ের কথাবার্ত্তা চালিয়েছেন, আমরা কেউ কিছু জানতাম না। কাল কথা ছিলো ওকে তাঁরা 'দেখতে' আসবেন। সব ঠিকঠাক, শুধু এই নাটকের প্রধানা পাত্রী অরুণাকেই কিছু বলা হয়নি। বলবার দরকার বোধ করেননি কেউ। কিন্তু অরুণা কিনা সোজা ব'লে বসলো, 'না'! তখন বেলা প্রায় দুপুর, কারুরই তখনো স্নানাহার হয়নি—এরই মধ্যে হঠাৎ ভয়ানক একটা লেগে গেলো। নিচে থেকে শুনলুম বাবার গলার আওয়াজ বাজের মত গুমগুম করছে। আঁচ করলুম এতদিনের নেপথ্য-নাট্য এবার উদ্ঘাটিত হ'লো রঙ্গমঞ্চে। এই নাটকে আমি উইঙ্গস্-এ লুকিয়ে বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত হবো, না কি নিজেও একটা পার্ট নিয়ে নেমে পড়বো তা ঠিক করতে খানিকক্ষণ গেলো। আমি

তখন সবে স্নান ক'রে উঠে চুপচাপ একটু বসেছি ; পৃথিবীর কারো সঙ্গেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবার মত মেজাজ তখন আমার নয়। তবু—সংঘর্ষেরও একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে বুঝি ; তাই সেই দৃশ্যের ক্লাইমাক্স্ যখন আসন্ন, যবনিকা পড়ে-পড়ে, এমনি সময় প্রবেশ করলেন অযাচিত অপ্রত্যাশিত সুখেন্দ্রবাবু।

যে-পার্টটা করলুম সেটা বীরের না ভাঁড়ের বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে পার্টটা না-নিলেও চলতো। অরুণার দিক থেকে কোনো দরকার ছিলো না। দরকার ছিলো আমার। পৃথিবীতে কত অন্যায় কত অত্যাচার তো চারদিকে হচ্ছে, আমরা সকলেই তো সক্রিয় না হোক্ নিষ্ক্রিয়ভাবে তার প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি ; কিন্তু একেবারে চোখের উপর যখন অন্যায় ঘটতে দেখি তখন থামাতে না-পারলেও অন্তত প্রতিবাদ করতেই হবে যে। করলুম প্রতিবাদ, তার পুরস্কারও পেলুম ; কিন্তু অসহায় নারীকে রক্ষা করবার গর্ব জুটলো না আমার কপালে। তখনই বুঝলুম অরুণা অসহায় মোটেও নয়, কারো আশ্রয়ের দরকার নেই তার—পেয়েছে, ও পেয়েছে, নিজের মধ্যে এমন শক্তি পেয়েছে যার সঙ্গে আর-কিছুরই তুলনা হয় না। নয়তো কী ক'রে এত সাহস হ'লো ঐটুকু মেয়ের যে প্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রান্ত কর্তৃত্বের রক্তচক্ষুর সামনে একবারও বুক কাঁপলো না।

ভদ্রলোকরা ফিরে গেলেন, নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়লো। বাড়ির হাওয়া যেন চাপা বিদ্যুতের টানা-হেঁচড়ায় গুম্ হ'য়ে আছে। ভালো লাগে না; পালাতে ইচ্ছে করে। অশোকের আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ হ'য়ে গেছে, অরুণার কানে-কানে চলেছে মা-র মধুর উপদেশ-

বাণী। আমি আছি দূরে, অরুণার সঙ্গে আমার কোনো কথাও হয়নি—তবু মনে হচ্ছে দ্বিতীয় অঙ্কের পালা সুরু হ'তে দেরি নেই, এবং সেটা যে কোন্ অন্তর্দ্ধানের বাঁকা রাস্তায় ট্র্যাজিডির মর্মে এসে পৌঁছবে তা-ও বুঝতে পারছি।

আপাতত এই পর্য্যন্ত। এখন আমার কথা যদি কিছু শুনতে চান, সে-কথা এই যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। পালাতে পারলে বাঁচি। ইতিমধ্যে এখানে দু' এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, একদিন ভালো ক'রে বর্ষা নামবে আকাশ-ভরা ঘনঘটায়। কিন্তু ঈশ্বর করুন, তখন যেন আমি কলকাতায় থাকি! কলেজ খোলবার আগেই প্রত্যাবর্ত্তনের একটা লাগসই অছিলা এখনো আবিষ্কার করতে পারছি না। আপনারা কবে ফিরবেন?

'সুমন্ত্র।'

'দি পাইন্‌স্, শিলঙ

১২ জুন

'হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেলো শিগগিরই আমরা কলকাতায় ফিরবো, এক সপ্তাহের মধ্যেই। জুলাইয়ের প্রথম দিকে ফেরবার কথা ছিলো, বাবা হঠাৎ মক্কেলের জরুরি তার পেয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। আপনিও আসতে দেরি করবেন না। কলেজ খোলবার আগে একদিন চিঁড়িয়াখানায় যাওয়া যাবে, কী বলেন? নাকি গরম হবে? নাকি বৃষ্টি হবে? তাহ'লে কোথায় যাবেন বলুন। তবে চলুন শিবপুরের বাগানে, গাছে-গাছে সেখানে—কে বাঁধবে ছড়া? আপনি। কে করবে খোদাই? আমি।

এতদিন পর কলকাতার কথা ভাবতে কী ভালোই লাগছে। নাকে আসছে দুপুরবেলার রাস্তার অ্যাস্‌ফল্টের গরম গন্ধ—কোথায় লাগে তার কাছে পাইনের হাওয়া।

আজ বড় তাড়াতাড়ি। আছে চায়ের নেমন্তন্ন এখনো তার সাজ বাকি : শিলঙ ছাড়বার আগে আপনার আর-একটা চিঠি যেন পাই।

'মায়া।'

পুঃ—কোনোদিন অরুণার সঙ্গে দেখা হবেই, তখন তাকে বলবো—কী বলবো জানিনে, হয়তো অনেক কথাই বলবো। সে কি আসবে কলকাতায় ? আর আপনি ?

'মায়া।'

'—লারমিনি স্ট্রিট

১৮ জুন

'কাল ওরা পালিয়েছে। অরুণা আর অশোক। বাবা বজ্রাহত, মা শয্যাগত। মধ্যবর্ত্তী দূত শ্রীযুক্ত সুমন্ত্রই শুধু আছে দাঁড়িয়ে! বাড়ির একটি জিনিসও অরুণা নেয়নি—আমি ভাবছি আজ কলকাতায় পৌঁছিয়েই অরুণা সাড়ি পাবে কোথায়। বিয়ে হবে আইনত, সে-সব আয়োজন প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যখন টের পাওয়া গেলো তার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত বাবা বাড়ির কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। নিয়মিত ক'রে যাচ্ছেন কাজ, আজ কোর্টেও গেছলেন। আর মা এমন কাঁদছেন। কষ্ট হয়, কিন্তু তাঁরাই তো এটা ঘটালেন। যত দোষই দাও যা-ই করো যে-প্রচণ্ড টানে এরা নিশ্চিত দুঃখের মুখে ঝাঁপ দিতে পারলো সেটা কি

কম? কী আছে এদের, যে-পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে নেকড়ের মত কামড়াকামড়ি সেখানে এরা বাঁচবে কেমন ক'রে? অশোক আমারই মত কলেজে পড়ে, স্কলার্শিপ পায়। যদি বলো এ থেকে এদের ঘোরতর সর্বনাশ আসবে তো আসুক না। সর্বনাশ তো কতরকমেরই আছে: নিজের হৃৎপিণ্ডকে নিজের হাতে চেপে থেঁৎলে দেয়াই কি কম সর্বনাশ! আমি তো জানি মনে-মনে যে এরা বাঁচবে, বাঁচবে এরা, বেঁচে গেলো এরা, পৌঁছলো এরা এদের চরম সার্থকতায়। পৃথিবীর কোন্ সর্বনাশ এখন এদের মারতে পারবে?

অরুণার সঙ্গে শিগগিরই কলকাতায় আপনার দেখা হবে। আরো একজনের সঙ্গে দেখা হবে, সে ছড়া বাঁধতে পারে না সেটা আগে থেকেই জানিয়ে রাখা ভালো। সে এখন এক দুঃখের ছায়া-ভরা বাড়িতে নিঃসঙ্গ বন্দীর মত, কিন্তু কোন্ দূরের দিগন্তে বুঝি চাঁদ উঠলো, একদিন সে কি উঠে আসবে না প্রত্যাশার বিশাল আকাশ ভ'রে। আসবে না?

সুমন্ত্র।'

একুশ

হোটেলের যে-ঘরটি অরুণা আর অশোক দখল করেছে সেটি তেতলায়। পূবে একটা জানলা, আর সে-জানলায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে সার্কুলার রোড আর প্রায় মুখোমুখি শেয়ালদা ইষ্টিশান। সার্কুলার রোডের ও-অংশটা মনোরম নয়; ধূলো উড়ছে, ধোঁয়া উঠছে, দিনে দু' একবার রাস্তার উপর দিয়ে এঞ্জিনে-টানা কুৎসিত রাবিশের গাড়ির যাওয়াই চাই। হোটেলের ঘরটি অতিরিক্ত বড় নয়; দেয়াল ঘেঁষে খাট, আর খাটের বরাবর একটি টেবিল, সেখানে সুমন্ত্র দু' একটা বইও রাখে আবার দু' বেলা ওখানেই তাদের খাবার দিয়ে যায়। একটা ড্রেসিং টেবিল ছিলো উল্টোদিকের দেয়ালে, অরুণা সেটা সরিয়ে এনেছে জানলার ধারে, আলো বেশি পাবে। ওদের কারো কিছু লেখাপড়া করতে হ'লে ঘরের একটি-মাত্র চেয়ার টেনে এনে সেই আয়নার টেবিলেই করতে হয়; আয়নায় নিজের মুখের ছবি বার-বার তপোভঙ্গ করে। অরুণা চেষ্টা করেছে আয়নাটা এমনভাবে রাখতে যাতে মুখ দেখা না যায়, কিন্তু যতবারই সে সেটাকে ঠেলে তুলে দেয়, ততবারই নেমে পড়ে ঠিক মুখের সামনে।

ঘরটার অসুবিধে অনেক; কিন্তু আপাতত ওদের দু'জনের কাছে

এর চেয়ে ভালো ঘর পৃথিবীতে নেই। এ-ঘর সব চেয়ে ভালো, কেননা এ-ঘর তাদের। একান্তই তাদের। ইচ্ছে করলেই দরজা বন্ধ করতে পারে তারা। ইচ্ছে করলেই দরজায় তালা দিয়ে যেতে পারে বেরিয়ে। আর, যা-ই বলো, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় ভালো লাগে। রাস্তায় কত-কিছু। নোঙরা, তা ঠিক, ঐ ধোঁয়া-উগ্‌রোনো ইষ্টিশানটাও দেখতে ভালো নয়, তবু—মোটের উপর কী চমৎকার ভাবো তো। সকাল থেকে চলেছে তো চলেইছে; আবার অনেক, অনেক রাত্রে যদি তাকিয়ে দ্যাখো, খাঁ-খাঁ করছে প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, ট্র্যাম-লাইনগুলো মাঝে-মাঝে গ্যাসের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে, একটা লোক নেই, ঐ পানের দোকানটা শুধু খোলা, হঠাৎ হয়তো একটা ট্যাক্সি ছুটে গেলো খটখট্ ক'রে। তখনো অদ্ভুত লাগে।

আর ভোরবেলা যখন রোদ আসে ঘরে, একটু এসে পড়ে বিছানায় আড় হ'য়ে—কেউ যেন অতি সূক্ষ্ম আদরে ঘুম ভাঙালো তার। ভোরবেলা অরুণার ঘুম ভেঙে যায়। এত ভোরে কখনো সে ওঠেনি, কিন্তু যে-মুহূর্তে রোদটুকু এসে বিছানায় পড়ে, অরুণার পক্ষে আর যেন শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। তার ইচ্ছে করে অশোকও উঠুক্, কিন্তু অশোক ঘুমের ঘোরেই দু' একটা কথা ব'লে আবার যে পাশ ফেরে, শিয়রে চা নিয়ে ধাক্কাধাক্কি না-করলে কিছুতেই ওঠে না। ততক্ষণে অরুণা স্নান সেরে নেয়, খুব সচেতনভাবে সিঁদুর পরে, অনভ্যস্ত হাতে সিঁদুরের গুঁড়ো রোজই প্রায় নাকের ডগায় লেগে যায়। অশোকের মুখে বুঝি রোদ পড়লো, দিলে জানলা ভেজিয়ে; পরিষ্কার করলে অ্যাশ্‌ট্রে, অশোকের ধার-করা দুটো-চারটে বই একটু গুছিয়ে রাখলে—তবু হোটেলের চাকর চা নিয়ে আসে না।

পারিবারিক

বেলা সেদিন সাড়ে-আটটা হবে। চা খাওয়া একটু আগে তাদের হ'য়ে গেছে; অশোক সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজের চাকরি-খালির পাতাটা খুঁটিয়ে দেখছে, আর অরুণা চোখ বুলোচ্ছে ছবির পাতে। একটু পরে অশোক ব'লে উঠলো :

'এই যে—পেয়েছি।'

'কী?'

'ম্যাট্রিকুলেশনের ছেলের জন্য মাষ্টার দরকার—আমার চেয়ে ভালো কোথায় পাবে?'

'ও।'

'ও বললে যে বড়? গায়ে লাগলো না? কড়কড়ে পঁচিশটাকা মাইনে।'

'এতই?' অরুণা হাসলো।

'আরে তোমার জন্যেও একটা আছে যে—এটা হচ্ছে বালিগঞ্জের মৃণ্ময়ী ইস্কুলে—মনে হয় তোমার কথা ভেবেই বিজ্ঞাপনটা লিখেছে।'

'কই দেখি।'

মুখ বাড়িয়ে সেই অতি ক্ষুদ্র অক্ষরের বিজ্ঞাপন সযত্নে পড়লো অরুণা।—'একটা চিঠি পাঠালে হয়।'

'পাঠালে হয়! বলো কী তুমি! এক্ষুনি! নিয়ে এসো কাগজ কলম।'

'লিখলেই হ'য়ে গেলো কিনা।'

'একটা হ'তেই হবে যে! না-হ'লে বাঁচবো কী ক'রে!' এই অতি কঠিন মর্মান্তিক সত্যটা হালকা হাসির ঢঙে উচ্চারণ করলে অশোক।

অরুণাও ঠিক সেই সুরেই বললে : 'না-হ'লে চলবেই না যখন, তখন হবেই।'

অশোক কাগজটা নামিয়ে রেখে বললে : 'এখানে আমরা এসেছি কতদিন হ'লো ?'

'একুশ দিন।' এক মুহূর্ত্ত দেরি না-ক'রে অরুণা জবাব দিলে। নিখুঁত হিসেবে ছিলো তার মনে। যেদিন তারা ঢাকা ছেড়ে এলো, সে-তারিখ কি সে জীবনে ভুলবে ?

'একুশ দিন—না ? যা টাকা আছে তাতে আর বড় জোর দশদিন হোটেলের খরচ চলতে পারে।'

'আমার তো মনে হয় ছোট একটা বাসা নিলে ঢের কম খরচ।'

'না-হয় সিগারেটটা ছাড়লাম,' নিজের মনের চিন্তার অনুসরণ ক'রে অশোক বললে। 'এমনিও তো আমার সখের ধূমপান।' তীর হাতের ফুরিয়ে-আসা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে এমনভাবে সেটা অ্যাশ্‌ট্রের গর্ত্তে ফেলে দিলে যেন এই তার জীবনের শেষ সিগারেট। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে : 'একটা বাড়িই নেবো। বাড়ি মানে অবিশ্যি দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট। তাতেই কুলিয়ে যাবে।'

'দেড়খানা দিয়েই বা কী হবে,' বললে অরুণা।

'দু'জনের সম্মিলিত আয় আপাতত যদি পঞ্চাশটাকা হয়—না, পঞ্চাশ টাকায় কী হবে, কলেজে তো পড়তে হবে দু'জনকেই। তারপর আস্তে-আস্তে একদিন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের কেউ-একটা হ'য়ে না যাই সেই হচ্ছে ভয়।'

অরুণা বললে : 'আমার আর পড়বার কী দরকার !'

'পাগল। তুমিই তো হচ্ছো ভবিষ্যতের আশা। তুমি যখন মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল হবে আমি সারাদিন অফুরন্ত আলসেমি করতে পারবো সেই আনন্দেই তো বেঁচে আছি।'

অরুণা একবার ভরা চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

খেতে পাবে কি না-পাবে তাদের এখনকার সমস্যাটা হচ্ছে এই। সমস্যাটা অতি সরল, এক কথাতেই বোঝা যায়। মনে-মনে দু'জনে অতি স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারছে; কিন্তু তাদের আলোচনার সুরে কখনোই বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে না। ম'রে গেলেও একজন কোনো ভয়ের ভাব দেখাবে না, পাছে অন্যের মধ্যে সেটা সংক্রামিত হয়। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের মধ্যে ওরা এমন কূলে-কূলে ভরা যে অন্য-কিছু তাদের যেন ভালো ক'রে স্পর্শ করতেই পারে না। পারস্পরিক সংস্পর্শের উত্তাপ জীবনের সকল ব্যাধির বিরুদ্ধে যেন এদের টীকে দিয়ে দিয়েছে। খেতে না-পাওয়াটা অতি ভয়ানক, কিন্তু তার সম্পূর্ণ ভয়ানকত্ব লাগছে না এদের মনে। এরা যে হালকাসুরে কথা কইছে, তা খানিকটা ইচ্ছাকৃত, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কিছু হবেই, কিছু-একটা হবেই: সত্যি-সত্যি তারা তো আর মরতে পারে না। জীবন যখন এমন অপরূপ দিগন্ত থেকে দিগন্তে খুলে গেলো, তখন কি উঁকি দিতে পারে মৃত্যুর দূত? তা কি হ'তে পারে?

সুতরাং অশোক সকালবেলার চা-পানান্ত মধুর আলস্যে আর-একটা সিগারেট ধরালো, এক মিনিট আগেকার সংকল্প ভুলে' গিয়ে। ধোঁয়া বা'র করতে-করতে বললে: 'ভেবে দেখছি, একশো টাকার কমে

কিছুতেই চলবে না। সকালবেলায় তুমি কলেজে পড়াবে আর দুপুরবেলায় ইস্কুলে পড়াবে; আমি ঘুরে-ঘুরে টিউশানি করবো যে-ক'টা পারি—বন্ধুরা অনেক আশ্বাস দিয়েছে। সারাদিন আমাদের দেখাশোনা হবারই ফুরসৎ নেই; কিন্তু সারাদিনের কাজের পরে সন্ধেবেলায়—'

'কিন্তু রান্না? খাওয়া?' প্রশ্ন করলে অরুণা।

'বাঃ! তুমি আছো কোথায়? চাকর থাকবে না আমাদের!'

'আবার চাকরও!'

'ছুটির দিনে মাঝে-মাঝে তুমি সমুদ্রের চাঁদা মাছ আনিয়ে সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এমন রান্না রাঁধবে—'

'হায়রে!' দীর্ঘশ্বাস ফেললে অরুণা।

'হেরিডিটিতে যদি এতটুকুও আস্থা থাকে—' বলতে-বলতে অশোক থেমে গেলো। চেয়ে দেখলো, ম্লান হ'য়ে গেছে, অরুণার মুখ। অশোকের চোখ তার উপর পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। দু' জনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত অঙ্গীকার ছিলো—কোনো পক্ষেরই পরিবারের কথা অন্য পক্ষ কখনো উল্লেখ করবে না। বিশেষ ক'রে অরুণার মা-বাবার কথা কখনোই যেন কোনো প্রসঙ্গে উঠে না পড়ে। এতদিনের মধ্যে ওদের ভুল হয়নি একবারও, পৃথিবীতে ওদের আর-কেউ কোথাও নেই এ-ভাণ ওদের একেবারে নিখুঁত, নীরন্ধ্র। আজ হঠাৎ এক অসম্বৃত মুহূর্তে অশোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো—কিন্তু চট্ ক'রে নিজেকে সামলে নিলে। অরুণার ফেরানো মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে কী ব'লে কথাটা শেষ করবে ভেবে পেলো না। মুখ নিচু ক'রে তাকালো খবরের কাগজের পাতায়।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। অশোক বললে: 'আমাদের বিনোদ এসেছে ট্যুশানির খবর নিয়ে। ভগ্নদূত হ'য়ে না-এলেই হয়।'

উঠে গিয়ে খুললে দরজা, একহাতে খবরের কাগজে জড়ানো কিছু পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে সুমন্ত্র ঢুকলো ঘরে।

'দাদা!' অরুণা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তাই তো মনে হচ্ছে', সুমন্ত্র মুচকি হেসে এগিয়ে এলো। 'বাঃ, ঘরটি বেশ তো। তোর চেহারা খুব ভালো দেখছি তো, অরুণা।'

অরুণা অভিভূতের মত অস্পষ্টভাবে বললে: 'কবে এলে তুমি?'

'এই তো আজই এলাম। তারপর অশোক, কেমন আছো বলো। তোমার চিঠির আর জবাব দিইনি—সশরীরে আবির্ভূত হবো ব'লে।'

'কত দেরি করলে তুমি আসতে', বললে অশোক।

'নিজের ইচ্ছায় নয়। আসতে পারলুম না।'

দুই বন্ধু জুতো খুলে খাটের উপর উঠে বসলো, অরুণা বসলো ঘরের একমাত্র চেয়ার কাছে টেনে এনে। জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার গাড়ি আজ এতই দেরিতে এলো? তোমার অন্য জিনিস কোথায়?'

'গাড়ি ঠিক সময়েই এসেছে', সুমন্ত্র ঈষৎ লজ্জিতভাবে স্বীকার করলে। 'হস্‌টেলে জিনিসপত্র রেখে এলাম।'

'আবার হস্‌টেলে গিয়েছিলে!' একটু পরে অরুণা বললে: 'আমি তো কত ভোরে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম—কই, তোমাকে তো দেখলুম না।'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো। 'ঐ খবরের কাগজে জড়ানো কী-সব আছে ত্যাখ্, তোর জন্যে দিয়েছে। আমসত্ত সরভাজা আচার—এতখানি

পথ যে নিরাপদে নিয়ে এলাম সে-কৃতিত্বটা একবার মনে-মনে ভেবে দেখিস্।'

সুমন্ত্র বললে, 'তোর জন্যে দিয়েছে', কে দিয়েছে বললে না। অরুণা আস্তে উঠে গিয়ে পুঁটলিগুলো খুললো; একটা বিস্কুটের টিনে তাকে-তাকে আমসত্ত, দুটো সিগারেটের কৌটো ভরা কুলের আর তেঁতুলের আচার—অরুণার সব চেয়ে প্রিয়—আর-একটা টিনে টুকটুকে লাল কড়া পাকের সরভাজা—তা ছাড়াও দেখা গেলো খবরের কাগজে জড়ানো একখানা নীল রঙের ঢাকাই জামদানি সাড়ি।

জিনিসগুলো দেখতে-দেখতে ঝাপ্সা হ'য়ে এলো অরুণার চোখ, তারপর দরদর ক'রে অশ্রু নেমে এলো তার দু' গাল বেয়ে। সে চাপতে চেষ্টা করলে না, লুকোতে চেষ্টা করলে না; নিঃশব্দে ও প্রকাশ্যে কাঁদতে লাগলো।

দু' বন্ধু ভাণ করলে যেন সেটা লক্ষ্য করেনি। সুমন্ত্র বললে: 'ব'লে দিয়েছিলো' (কে বলেছিলো বললে না) 'ইচ্ছে করলে দু' একখানা খেতে পারি ইষ্টিমারে। বুঝলি অরু, ইচ্ছে যে একেবারে করেনি তা-ও নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য্য সংযম! এমন কোথাও দেখেছিস?'

অশোক বললে: 'অরুণা, তুমি করছো কী! চা কোথায়? এখনো কি হোটেলের ঐ চিনির সরবৎ খেতে হবে? তোমার খুদে ষ্টোভ ধরাও এইবারে—সুমন্ত্র, এ-বেলাটা এখানেই কাটাবে তো?'

সুমন্ত্র অলক্ষ্যে একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়ে বললে: 'আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে—ও-বেলা, আসবো আবার।'

'কেন, থেকে যাও না।'

'না, না, সে হয় না।' আর-কোনো অছিলা খুঁজে না-পেয়ে সুমন্ত্র বললে: 'গোটা কয়েক জিনিস এক্ষুনি না-কিনলে আর চলছে না।'

মায়াদের বাড়ি ভবানীপুরে, যেতে অন্তত আধ ঘণ্টা। দশটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে, তার পরে আবার বড্ড দেরি হ'য়ে যায়। 'যেদিন কলকাতায় পৌঁছবেন সেদিনই আসবেন কিন্তু', শেষের চিঠিতে মায়া লিখেছে।'

'তাহ'লে বিকেলে নিশ্চয়ই এসো। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কথা আমারও কিছু কম নেই। তবে আপাতত ও-সব কথার চাইতে ঢের ভালো হবে সকলে একসঙ্গে ব'সে চা-খাওয়া।' অরুণার কান্নায়-ভাঙা মুখের দিকে অনায়াসে তাকিয়ে সুমন্ত্র বললে: 'এই অরুণা —চা কর্ না একটু।'

অরুণার কান্নার ঝোঁকটা থেমে এসেছিলো, চোখ মুছে গেলো দেয়ালের কোণে, মেঝেতে ব'সে ষ্টোভ ধরিয়ে লেগে গেলো চা করতে। নিজেদের চায়ের সরঞ্জাম তারা করেছিলো হোটেলে দু' দিন বসবাসের পরেই। ছোট্ট ষ্টোভ, ছোট্ট প্যান, গোটা চারেক পেয়ালা—চিনি আর টিনের দুধ; চায়ের জন্য, অন্তত, কোনো হোটেলওয়ালার মরজির অধীনে থাকতে রাজি নয় অশোক সেন। চা তৈরি হ'লো, চায়ের সঙ্গে অরুণা সরভাজা পরিবেষণ করলে।

অশোক হেসে বললে: 'থাক্, থাক্, ও-সব তোমারই জন্যে—'

পারিবারিক

'আহা—আমি রাক্ষস কিনা! তাড়াতাড়ি খেয়ে না-ফেললে প'চেই যাবে—'

'এ-যুক্তিটা ভালো বটে', ব'লে সুমন্ত্র সকলের আগে আস্ত একখানা তুলে মুখে দিলো। 'তুইও খা অরুণা। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস নেই।'

তিনজনে গল্প করতে-করতে চা খেলো। কথায়-কথায় হাসি-ঠাট্টার ছড়াছড়ি, অরুণাও যোগ দিলে তাতে। তার মুখে অশ্রুর দাগ তখনো লেগে রয়েছে—কিন্তু এখন তার কথা শুনে তার হাসি শুনে কে বলবে যে একটু আগে সে এত কেঁদেছে! তারপর সুমন্ত্র হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'ও কী! উঠছো নাকি?'

সুমন্ত্র বন্ধুর দিকে ভালো ক'রে না-তাকিয়ে বললে: 'সাড়ে-ন'টা বাজলো।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'হস্‌টেলের এক ছেলেকে আবার কথা দিয়ে এসেছি—আর বোলো না, যত সব উৎপাত।' ব'লে সুমন্ত্র হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'যাবে দাদা এখনি?" অরুণা সুমন্ত্রর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলো দরজা পর্য্যন্ত। অশোকও আসছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে র'য়ে গেলো ঘরের মধ্যেই। দু' ভাই-বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'লো তার এখন একটু দূরে থাকাই ভালো।

দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় এসে সুমন্ত্র আর অরুণা একটু

দাঁড়ালো। সুমন্ত্র পকেট থেকে একটা খাম বার ক'রে কিছু না-ব'লে অরুণার হাতে দিলে। খামটা সাদা, উপরে কিছু লেখা নেই। অরুণা খুলে দেখলো ভিতরে একগুচ্ছ দশটাকার নোট—গুনেও দেখলে, কুড়িখানা। তা ছাড়া আর কিছু নেই, একটা চিঠি না, একটা কথা না।

'মা লুকিয়ে দিলেন', সুমন্ত্র নিচু গলায় বললে।

'আর বাবা?' রুদ্ধস্বরে বললে অরুণা।

'বাবা কিছু বলেননি।'